BANGLA SAMAJ SANSKRITI O RAJNAITIK ETIHAS ABONG BANGLA SAHITYA, UNABINGSHA O BINGSHA SHATABDI

MA [Bengali]

BNGL 801C

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Rejaul Karim

Aliah University

Authors

Supriya Kumar Das: Units (1 & 2) © Reserved, 2016

Shyamal krishna Ray: Unit 3 © Reserved, 2016

Swasti Mandal: Unit 4 © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস

প্রথম একক : ১৮০০ - ১৮৫০ **(পৃষ্ঠা 1-32)**

ভূমিকা, উদ্দেশ্য, অষ্টাদশ শতকের অন্তিম ও উনবিংশ শতকের সূচনালগ্ন : অস্থির বঙ্গজীবন, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন, স্কুলবুক সোসাইটি, আত্মীয়সভা ও অন্যান্য সভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনাপর্ব, রামমোহন রায় ও অন্যান্য লেখকগন (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত), রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, কবিওয়ালা, কবিগান ও কবিতার উন্মেষকাল, আদর্শ প্রশ্নাবলী, সহায়ক গ্রন্থ।

দ্বিতীয় একক : ১৮৫১ - ১৯০০ **(পৃষ্ঠা 33 - 81)**

ভূমিকা, উদ্দেশ্য, বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও আর্থনৈতিক ইতিহাস, আধুনিক যুগের বিকাশকালে বাংলা সাহিত্যের গতিধারা, গদ্য ও প্রবন্ধচর্চার বিস্তৃতি, বাংলা উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যের ঐতিহাসিক পর্যায়, রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য শালির গতিপ্রকৃতি, বাংলা সাময়িক পত্র-পপত্রিকার অগ্রগতি। আদর্শ প্রশ্নাবলী, সহায়ক গ্রন্থাবলী।

তৃতীয় একক : ১৯০১ - ১৯৪৭ **(পৃষ্ঠা 83 - 102)**

বীশ শতকের প্রথমার্ধ, বিশশতকের রাজনৈতিক পটভূমি, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, আদর্শ প্রশ্নাবলী, সহায়ক গ্রন্থ

চতুর্থ একক : স্বাধীনতা উত্তর বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্য **(পৃষ্ঠা 103 - 128)**

ভূমিকা, উদ্দেশ্য, সমাজ রাজনীতি নির্ভর পরিবেশ, স্বাধীনত্তর বাংলা উপন্যাস, স্বাধীনোত্তর বাংলা ছোটো গল্প, আদর্শ প্রশ্নাবলী, সহায়ক গ্রন্থ

সূচিপত্র

প্রথম একক : ১৮০০ - ১৮৫০ (পৃষ্ঠা 1-32)

ভূমিকা
উদ্দেশ্য
অষ্টাদশ শতকের অন্তিম ও উনবিংশ শতকের সূচনালগ্ন : অস্থির বঙ্গজীবন
প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন
স্কুলবুক সোসাইটি,
আত্মীয়সভা ও অন্যান্য সভা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনাপর্ব,
রামমোহন রায় ও অন্যান্য লেখকগন (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)
রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস
কবিওয়ালা, কবিগান ও কবিতার উন্মেষকাল,
আদর্শ প্রশ্নাবলী
সহায়ক গ্রন্থ।

দ্বিতীয় একক : ১৮৫১ - ১৯০০ (পৃষ্ঠা 33 - 81)

ভূমিকা
উদ্দেশ্য
বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও আর্থনৈতিক ইতিহাস,
আধুনিক যুগের বিকাশকালে বাংলা সাহিত্যের গতিধারা
গদ্য ও প্রবন্ধচর্চার বিস্তৃতি
বাংলা উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যের ঐতিহাসিক পর্যায়
রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য শালির গতিপ্রকৃতি,
বাংলা সাময়িক পত্র-পপত্রিকার অগ্রগতি
আদর্শ প্রশ্নাবলী
সহায়ক গ্রন্থাবলী।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তৃতীয় একক : স্বাধীনতা পূর্বপর্ব (১৯০১ - ১৯৪৭)(পৃষ্ঠা 83 - 102)

ভূমিকা
উদ্দেশ্য
বীশ শতকের প্রথমার্ধ
বিশশতকের রাজনৈতিক পটভূমি
বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা,
আদর্শ প্রশ্নাবলী
সহায়ক গ্রন্থ

চতুর্থ একক : স্বাধীনতা উত্তর বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্য (পৃষ্ঠা 103 - 128)

ভূমিকা
উদ্দেশ্য
সমাজ রাজনীতি নির্ভর পরিবেশ
স্বাধীনত্তর বাংলা উপন্যাস,
স্বাধীনোত্তর বাংলা ছোটো গল্প
আদর্শ প্রশ্নাবলী
সহায়ক গ্রন্থ

ভূমিকা

টিপ্পনী

আধুনিক ভারতীয় ভাষা গুলির মধ্যে বাংলা আন্যতম উন্মত ভাষা। প্রাচীন বাংলা অর্থাৎ চর্যাপদের যুগ থেকে মধ্যযুগের বাংলার স্তর পেরিয়ে উন্মত ও উৎকর্ষাত্ম এই বাংলা ভাষার বর্তমান বৈচিত্রময় প্রকাশ। 'বাংলা সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্য [ঊনবিংশ ও বিশ শতাব্দী]'মডিউলটি চারটি (৪) এককে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম এককে ১৮৮০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্নিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের অন্তিম ও ঊনবিংশ শতকের সূচনালগ্ন এবং অস্থির এই বাংলায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সময়ের সমাজ, সংস্কৃতি, সভা, সমিতি, পত্রপত্রিকা, রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠ বিশ্লেষণ করে পাঠক ও ছাত্র - ছাত্রীদের উপকৃত করার প্রচেষ্টা আছে এই মডিউলে।

দ্বিতীয় এককে ১৮৫১ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ইতিহাসও নাট্য সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির কথা স্থান পেয়েছে। তৃতীয় এককে স্বাধীনতা পূর্বপর্ব অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক পটভুমি, ও বাংলা সাহিত্যের নাট্যজগৎ, সাময়িক পত্র, কথাসাহিত্য, এবং কাব্য কবিতার কথা আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ এককে স্বাধীনতা উত্তর সমাজ পরিবেশ ও রাজনৈতিক পটভূমির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা পাঠক ও ছাত্র - ছাত্রীদের দিকে লক্ষ্য রেখে ''বাংলা সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্য [ঊনবিংশ ও বিশ শতাব্দী]'' মডিউলটি রচিত এবং প্রত্যেকটি এককের পরে সাম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ও সহায়ক গ্রন্থের নাম যা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপকৃত হবে বলে আশারাখি।

প্রথম একক ১৮০০-১৮৫০

টিপ্পনী

১.১.১. ভূমিকা –

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির আগ্রাসন বাংলার জনজীবনকে অস্থির করে তুলেছিল। পলাশীর যুদ্ধ থেকে সিপাহী বিদ্রহের কাল পর্যন্ত কোম্পানীর শোষন ও শাসনের চাপে সাধারন মানুষ অতিষ্ট হয়ে ওঠে। নবাবী আমলের অবসান ঘটেছে ইংরেজ ভারত জয়ে মশগুল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বার বার বাংলার মানুষ বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে, খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভারতে আগমন ও শিক্ষা ধর্ম বিষয়ে সচেতন করে তোলা নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। কোম্পানীর শাসন ও শিক্ষা ব্যাপারে নতুন কৌশল গ্রহন, ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের উপরে প্রথমে কোম্পানী চাপ সৃষ্টি করলেও পরে রক্ষনশীল মনোভাব ধরে রাখতে পারেনি। সামাজিক – রাজনৈতিক ও শিক্ষারর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তির অনুপ্রবেশ নব চেতনার সূত্রপাত করলো। ভারতীয় রক্ষনশীল ও পাশ্চাত্য-শিক্ষিতদের মধ্যে অভিঘাত পরিলক্ষিত হল।

বাংলা গদ্যের সূচনা, রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা, ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্মের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মানসে ঘটল জাগরন। হিন্দু কলেজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, ব্রাহ্ম সমাজ, 'তত্ববোধিনী সভা', মেডিকেল কলেজ, মেয়েদের স্কুল এবং সাময়িক পত্র পত্রিকা – বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে ব্যাপক প্রভাব আনল। কেরি, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, প্রমুখ মানুষের ছোঁয়ায় উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধ বাংলা গদ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির উন্মেষ লগ্ন সূচিত হল।

১.১.২. উদ্দেশ্য –

আদি-মধ্য ও বর্তমানের নিরিখে বাংলা সাহিত্যের বিপুল কলেবর বাংলা ভাষার উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠতার প্রমান করে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম নির্ভর সাহিত্যের অবসান ঘটে ভারতচন্দ্রের প্রয়ানের পরে। বাংলার সমাজ – সংস্কৃতিতে ও মননলোকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম ও উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে পাশ্চাত্যের যুক্তি ও বিজ্ঞান

টিপ্পনী

অনুশীলনের আলোকরাশি আছড়ে পড়ল। এই আলোকরাশির প্রভাবে বঙ্গজীবন ও সংস্কৃতি সাহিত্যে আনল নবজাগরন।

পাশ্চাত্য নবজাগরনের প্রভাব আমাদের রাজনীতি, সমাজ-জীবন ও সাহিত্যে বিপুল পরিবর্তন সাধনে সঞ্জীবনীসুধা হয়ে উঠল। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল, বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশ, সাময়িক পত্র পত্রিকা প্রকাশ, বঙ্গে নাট্যশালা তৈরির প্রয়াস এবং গড়ে উঠল স্বাধীনতা ও জাতীয়তা বোধ। এই এককটি পাঠে জানতে পারবো–

- বঙ্গজীবন ও সমকালীন রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজনীতি।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও ভূমিকা।
- বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা পর্ব।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও তার লেখক গোষ্ঠী।
- ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রামমোহন ও অন্যান্য লেখকগন।
- ১৮০০-১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাময়িক পত্র পত্রিকার ইতিহাস।
- কবিওয়ালা-কবিগান ও কাব্য রচনার প্রয়াস।
- নাট্যশালা ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস।

১.১.৩. অষ্টাদশ শতকের অন্তিম ও উনবিংশ শতকের সূচনা লগ্ন – অস্থির বঙ্গজীবন।

মধ্যযুগের অবসান পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকরাশি বঙ্গজীবনে তুলেছে চিন্তা-চেতনার আলোড়ন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার পরাজয়ের মধ্যদিয়ে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত ঘটল। ১৭৬৫ তে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ এবং সমাজ-সংস্কৃতি শিক্ষা রাজনীতিতে প্রবল অভিঘাত দেখা দিল।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক চরম সংকটময় কালে-চরম সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। ভারতে কোম্পানীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এমন সময় ১৭৯৮ সালে ওয়েলেসলি ভারতে ইংরেজ ক্ষমতা বিস্তারের জন্য দায়িত্বভার গ্রহন করেন। ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, নিজামের সঙ্গে সন্ধি, টিপু সুলতানের রাজ্য আক্রমন ফলে তাঞ্জোর, সুরাট ও কর্নাটক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্তি। কৌশলী, বিচক্ষন, গভর্নরের

'অধীনতামূলক মিত্রতানীতি'র শর্তাবলী আরোপ। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রনজিৎ সিংহের অমৃতসর জয় ও বেসিনের সন্ধি। ১৮০৩ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সূচনা, ১৮০৯ – অমৃতসরের সন্ধি। ১৮১৮ মারাঠা শক্তির পতন। ১৮৩৮ সালে শাহসুজা, ইংরেজ এবং রনজিৎ সিংহের মধ্যে এক ত্রি-শক্তি মিত্রতা চুক্তি। ১৮৪৫ সালে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সূচনা। ১৮৪৮ সালে ইংরেজশক্তি ও শিখদের মধ্যে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের অবতারনা। ১৮৪৯ সালে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ, গুজরাট, পাঞ্জাব হয়। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা অর্থনীতি ও শিল্পের উপর ব্যাপক আঘাত হেনে ছিল, যার ফলে কৃষিভিত্তিক ভারতভূমির গ্রামীন অর্থনীতি একেবারে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল । দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী শিল্প ধ্বংস হয়েছিল এবং খুলে গিয়েছিল বিলাতি পন্যের বাজার। কৃষক এবং শিল্পী কারিগররা এক চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে নাভিশ্বাস অবস্থা।

ভারতবর্ষের এমন অবস্থা বাংলাকে বাদ দিয়ে নয়। নগর পুড়লে কি দেবালয় এড়ায় – এমন এক দুর্দিনে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল কৃষক সম্প্রদায়। ভূমির উপর মালিকের স্বত্ত্ব স্বীকৃত হলেও কৃষকের কোন ভূমিকা ছিল না । ফলে জমিদারদের হুমকি, উচ্ছেদ, খাজনা আদায়ের পরিমান বৃদ্ধি, জোর করে সই করিয়ে নেওয়া চলতে থাকে । এমন ইতিহাস সম্মত বিষয় গুলি বাংলা সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছিল, রামমোহন রায়, লালবিহারী দে, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্রের মত লেখকরা কৃষকের দুর্দশার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই সর্বাগ্রে দায়ী করেছেন। এমন অবস্থায় এক সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হয়।

ইংরেজ শাসনের সূচনালগ্ন থেকেই – ভারতবর্ষের বৃহত কৃষক সম্প্রদায়, তাঁতি, কারিগর, শিল্পী-শ্রমিকশ্রেনীর মানুষরা শাসকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। ইংরেজদের শাসন-শোষন ও স্বৈরাচারীতার বিরুদ্ধে 'সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ' সংগঠিত হয়। ঢাকাকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত হলেও পরে মালদা, রংপুর, বওড়া, দিনাজপুর, কুচবিহার, ফরিদপুর ও মেমনসিংহে ছড়িয়ে পড়ে। এরা বেশিরভাগ ছিল কৃষিজীবি, কর্মচ্যুত সৈন্য, রেশন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত । এছাড়া সন্ন্যাসীদের উপর তীর্থকর, ফকিররদের দরগায় যেতে বাধাপ্রদান প্রভৃতির ফলে 'সন্ন্যাসী-ফকির' বিদ্রহের সূত্রপাত । ইতিহাস থেকে এই বিদ্রহের নেতাদের নাম জানা যায়, যেমন – দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক, মজনু শাহ, মুসা শাহ ও চিরাগ আলি প্রমুখের কথা ।১৭৬৯ সালে নোয়াখালিতে দরিদ্র-মুসলিম কৃষকদের সন্দীপ বিদ্রোহ । ১৭৮৩ সালে ইজারাদারদের বিরুদ্ধে রংপুরে কৃষক বিদ্রহ। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, ধলভূম এলাকায় 'চুয়াড় বিদ্রোহ' । তিতুমিরের নেতৃত্বে বাংলায় বারাসাত বিদ্রোহ । বাংলায় মুসলিমদের 'ফরাজি আন্দোলন' ব্যাপক বিস্তার করেছিল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সমগ্র ভারত তথা বাংলার বিদ্রোহ সংগ্রামের অস্থির ভূমিতে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্যের প্রভাবে সরকারের প্রচেষ্টায় ১৭৮১ 'কলকাতা মাদ্রাসা', ১৭৮০ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী চার্লস গ্রান্ট ভারতে একটি সুসংবদ্ধ শিক্ষাব্যাবস্থা প্রচলনের জন্য দাবি তোলেন। চার্লস গ্রান্ট তাঁর 'Observation' এ ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে রায় দেন, যার ফলে ভগ্ন সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা, রীতিনীতি, সংস্কৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্যে ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠা। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ড, কেরি ও মার্শম্যানের উদ্যোগে 'শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন' প্রতিষ্ঠা। ১৮৩০ এ 'জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন', ১৮২০ সালে 'চিশপ কলেজ', ১৮৩৫ 'কলকাতা মেডিকেল কলেজ', 'সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ', 'লরেটো হাউস কলেজ' প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮১৭ – 'হিন্দু কলেজ', 'ক্যালকাটা বুক সোসাইটি' এবং ১৮১৮ 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৪ ক্রীষ্টাব্দে হার্ডিং ঘোষনা করেন ইংরেজি ভাষাজ্ঞানকে চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বাংলার সমাজ ব্যবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন দেখা দেয়।

বিলাতি শিক্ষা ব্যবস্থার ও জ্ঞানের বিজ্ঞানের প্রসার ও তার প্রভাবে বাংলায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্তিবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বৃটিশ শিল্পপতি ব্যবসা বানিজ্য দেখাশোনার জন্য – ক্লার্ক, এজেন্ট এবং প্রশাসনিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু পদ সৃষ্টি হল যারা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হিসাবে পরিচিত লাভ করল। ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলিকাতা কর্মলালয়' গ্রন্থে এই শ্রেনীর মানুষদের ক্রিয়া বর্ননা করা হয়েছে। এরা ইংরেজ কোম্পানির গোমস্তা, বেনিয়ান হিসাবে প্রথমদিকে কাজ করত, অষ্টাদশ শতকেই আলো, ডাকব্যবস্থা, টেলিগ্রাম ব্যবস্থার ব্যবহার কলকাতাবাসীর জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটাল। নগর কেন্দ্রিক শিক্ষিত সম্প্রদায় যাদের মধ্যে ধনী তারা সমাজব্যবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজন বোধ করল। যেমন নবকৃষ্ণদে, নিমমাইচরন মল্লিক প্রমুখরা এলিট ক্লাসের পর্যায়ভুক্ত হলেন। এই সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের অন্তিম এবং ঊনবিংশ শতকে মধ্যবর্তী সময়ে কলকাতায় বাবুসমাজের অবির্ভাবে বাংলায় এক নতুন ভাবধারার সূচনা হল। এই বাবুরা খোশমেজাজী, আরামপ্রিয়, পানাসক্ত, উৎসৃঙ্খল চরিত্রের যা বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রবন্ধে আনেকখানি তুলে ধরেছেন।

ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়কে পাশ্বাত্য সংস্কৃতি আকর্ষন করতে থাকে ফলে উনবিংশ শতকে মধ্যবর্তী সময়থেকে দেশীয় সংস্কৃতির যে ধারাটি প্রচলিত ছিল তা অন্তগামী হয়ে পড়ে। এ সময় বিদেশী রঙ্গালয় সংগীতের প্রতি তাদের প্রবল আকর্ষন

লক্ষ্য করা যায়। খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদারনৈতিক প্রভাব ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে দেশীয় মানুষ পাশ্বাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে লেখক, আইনজীবি, ক্লার্ক, পন্ডিত প্রভৃতি কাজে যোগ দান করতে দেখা যায়। এক দিকে মানুষ পাশ্বাত্যের প্রতি মনোনিবেশ মগ্ন হলেও কিছু ভদ্রলোক পাশ্বাত্য করনের দিকে থাকলেও তারা দেশীয় কবি, টপ্পা, ঘেউড়ে বিনোদনের রসদ খুঁজে পেল, আবার এই ভদ্র সম্প্রদায়ের মানুষরা শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতিও মনোনিবেশ করতে দেখা যায়। এমন এক সন্ধিক্ষনে দেশীয় সংস্কৃতি চোরা স্রোত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির খোলাবাতাস এই দুই টানাপোড়েনে শিক্ষিত ভদ্র শ্রেনীর মানুষের এমন দ্বিমুখীতাহ যেন ভবিতব্য। একথা ঠিক উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর কলকাতার রাতের মাদকতা টপা, ঘেউড়, বুলির কবিয়ালদের শক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস এই পর্যায় খুবই উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ দেশীয় সংস্কৃতিও পাশ্বাত্য সভ্যতার প্রবল অভিঘাতে বঙ্গজীবন হয়ে উঠেছিল অস্থির।

টিপ্পনী

১.১.৪. প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন–

১৮০০-১৮৫০ সাল প্রস্তুতির কাল। শুধু সাহিত্যের প্রস্তুতির কাল নয়, "আধুনিক যুগের বাঙালী-জীবন ও সংস্কৃতির পক্ষে"ও তা অনবদ্য ভূমিকা রাখে। এই প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপ হল শিক্ষা। সংঘাতের মধ্য দিয়েই তার যাত্রা শুরু, "ধর্ম-সমাজ ও জীবনের, মৌলিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এ সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। আর সংঘাতের ফলে গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান।" (গোপাল হালদার) একে একে কলকাতা মাদ্রাসা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, সংস্কৃত কলেজ, আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ, তত্ত্ববোধিনী সভা, পত্র-পত্রিকা, নাট্যশালা প্রভৃতি।

কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১)

অষ্টাদশ শতকে শেষ লগ্নে বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস এর উদ্যোগে মুসলিম আইন চর্চা ও আরবি-ফরাসি বিদ্যাচর্চার জন্যই 'কলকাতা মাদ্রাসা'র উৎপত্তি। ব্রিটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে পাশ্বাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বিপক্ষে ছিলেন কারন ভারতবাসীদের যদি উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত করা হয় তাহলে তাদের স্বাধীনতা লাভের মনোভাব জন্মাবে এটাই ছিল তাদের চিন্তার কারন। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাচ্যবিদ্যার অন্যতম নায়ক তাই তিনি তার উদ্দেশ্য পুরনে 'কলকাতা মাদ্রাসা' স্থাপন করলেন।

টিপ্পনী

এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪)

'কলকাতা মাদ্রাসা'র মত 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রাচ্য বিদ্যার উদ্দেশ্যে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় বাংলার বাইরে বারানসীতে জোনাথন ডানকান সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে 'বারানসী সংস্কৃত কলেজ' (১৭৯২) স্থাপন করেন। এগুলি ছিল প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০)

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সাহিত্য সমাজ ও বাঙালী মনোলোকে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল , এক দিকে প্রাচ্য বিদ্যার অগ্রগতিতে তার অবদান অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার জয়যাত্রাকে নিশ্চিত করেছিল। ইংল্যান্ড থেকে আগত ১৫-১৮ বছর বয়স্ক সিভিলিয়ানদের প্রাচ্যভাষা শিক্ষাদানের জন্যই ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ঠা মে আনুষ্ঠানিক ভাবে Fort William College এর কাজকর্ম শুরু হয়। এখান থেকে ইউরোপীয় শাসন তথা উপনিবেশিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সূত্রপাত । কলকাতার লালবাজারের কাছেই এই কলেজ গড়ে উঠেছিল। আগত সিভিল সার্ভেন্টদের শাসনকার্যে সহায়তার জন্য শুধু প্রাচ্য বিদ্যা যথেষ্ট নয়, তাই ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষার মেল বন্ধন করলে প্রকৃত প্রশাসনিক সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

ওয়েলেসলির আশা ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় গড়ে উঠবে। দৃঢ় বিশ্বাস Fort William College, 'Oxford of the East' হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। আধুনিক শিক্ষার পীঠস্থান এই কলেজে – বাংলা, আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত, তামিল, গ্রীক, লাতিন, হিন্দু আইন, ইসলামিয় আইন ও ভাষা সাহিত্য, ইতিহাসের পাঠদান করা সম্ভব হয়েছিল । শুধু আইন, ভাষা, ইতিহাস নয়, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় পাঠক্রমে ছিল। এই কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন – উইলিয়াম কেরি। আইন ও সরকারি বিভাগে G.H. Banlaw, I.H. Harington, হিন্দু আইনে- H.T. Baillie, গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য বিষয়ে – Rev. Buchanan, হিন্দু স্থায়ী ভাষা বিষয়ক – J.B. Gilchrist প্রমুখ বিদেশী ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল পন্ডিত ব্যক্তিদের।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনে বিখ্যাত

ব্যক্তিদের স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শ্রীরামপুর মিশন ও এশিয়াটিক সোসাইটি।

টিপ্পনী

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানে এক জোয়ার নিয়ে এল। কলেজে পাঠক্রমের জন্য গ্রন্থ অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এই কলেজে যে সকল বাঙালী পন্ডিত নিয়োজিত ছিল তারা গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হলেন, এদের মধ্যে উইলিয়াম কেরি সহ-রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলকনাথ শর্মা, তারিনীচরন মিত্র, চন্ডীচরন মুন্সী, হরপ্রসাদ রায়, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কথা উল্লেখ করা যায়। এদের রচিত গ্রন্থ গুলি 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠীতে আলোচিত হবে' ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কার্যকাল ১৮০১ সাল থেকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, এই কলেজের ক্রিয়াকান্ড স্তব্ধ হওয়ার পশ্চাতে ছিল ১৮০৬-৭ সাল নাগাদ ইংল্যান্ডে হেলিবেরিতে সিভিলিয়ানদের জন্য কলেজ স্থাপিত হওয়া।

শ্রীরামপুর মিশন-

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারার্থে এসেছিলেন, বিশেষ করে বাংলায় তারা গীর্জা ও কুঠী তৈরী করে সেই কাজকে অগ্রগতি দান করেছিলেন। মার্শম্যান কেরি প্রমুখ ব্যাপ্টিস্ট মিশনারীরা দীনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে মিলিত হয়ে ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশনের সূচনা করলেন। ধর্মপ্রচারের জন্য এ দেশে আসলে ও এই মিশন ভাষা ও সাহিত্য চর্চা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করতে দেখা যায়। এই মিশন থেকে কেরির বাইবেল অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কেরির উদ্যগে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও মুদ্রনযন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কৃতিতে এক অবিস্বরনীয় ঘটনা। এই ছাপাখানায় চার্লস উইলকিংস ও বাঙালী পঞ্চানন কর্মকার যোগ্যতার পরিচয় দান করেছেন। এখান থেকেই – বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্ট, ওল্ড টেস্টামেন্ট, বাঙলা ব্যাকরন, বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ পায়। মুদ্রন সংস্থার সহযোগিতায় মাসিক 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পন' প্রক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গদ্য অনুবাদগ্রন্থ, পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে শ্রীরামপুর মিশন সল্পকালীন হলেও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭)

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্মকান্ড সংকুচিত হলেও মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য

টিপ্পনী

শিক্ষার মনভাব প্রবল হয়ে উঠল। দেশীয় মানুষের জন্য ইংরেজী ও বাংলায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হল 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'। এ সময়ই পাঠশালা সংস্কার ও আদর্শ বিদ্যালয় কাঠামো গড়ার জন্য তৈরী হল 'স্কুল সোসাইটি' (১৭১৮)। এখানে পাঠ্যপুস্তকও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। 'স্কুলবুক সোসাইটির'- সভ্যরা হলেন উইলিয়াম কেরি, রাধাকান্ত দেব, তারিনীচরন মিত্র এবং রামকমল সেন। এই দুই সংস্থারই কর্মকর্তা হলেন ডেভিড হেয়ার। এই সোসাইটি – বাংলা, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। গনিত, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরন, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।সাধারন ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য রেখে নীতিকথা, হিতোপদেশ, জাতীয় রচনা যেমন ছিল তেমনি রামমোহন রায়ের ভূগোল, পীয়ার্স এর অনুদিত গ্রন্থ, ফেলিক্স কেরি, জনক্লার্ক মার্শম্যান ও উইলিয়াম ইয়েটস প্রমুখের গ্রন্থ প্রকাশ করে স্কুলবুক সোসাইটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো তাঁর রিপোর্টে ভারতে শিক্ষার বেহাল অবস্থার কথা উল্লেখ করেন ১৮১০ সালে। কোম্পানীর বিরুদ্ধে মিশনারীদের ক্ষোভের বহিপ্রকাশ ঘটে। ১৮১৩ সালে সনদ আইন পাশের ফলে জনশিক্ষার জন্য কোম্পানী আনুদান ঘোষনা করে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' বা 'জনশিক্ষা কমিটি' গঠিত হয় । কমিটির সুপারিশ ক্রমে কলকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' (১৮২৩) স্থাপনকরা হয়। প্রাচ্য শিক্ষা মূলত সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা কিন্তু রামমোহন রায় শুধু প্রাচ্য বিদ্যার আবতারনার কথা স্বীকার করে প্রতিষ্ঠানকে পাশ্চাত্য শিক্ষার উপযুক্ত করে তোলার পক্ষে ছিলেন। তাই তিনি কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে একটি পত্রে লেখেন সংস্কৃত শিক্ষার অসারতার কথা। এতেই শান্ত থাকলেন না তিনি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ও ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য দরবার করেন। রামমোহন যে নবজাগরনের প্রান পুরুষ তার প্রমান মেলে এই পত্রে। ১৮২৩ সালে স্থাপিত সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর। বিদ্যাসাগর শিক্ষাদানের দ্বায়িত্ব পালন করেন। তাকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী লেখক ও সংস্কারপন্থী গোষ্ঠী তৈরী হয়।

বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে উনভুত লেখক গোষ্ঠী সংস্কৃত কলেজ গোষ্ঠী নামে পরিচিত। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা শিক্ষা সমাজ সংস্কারের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠলেন।তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মুক্তারাম বিদ্যানবীশ, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষন ছাড়া রামনারায়ন ও বিহারীলাল চক্রবর্তী বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরনায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত । মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ

বিদ্যাসাগরের সহপাঠী ছিলেন । তাঁর দুইখান রচনা – আরবীয়পাখ্যান (১৮৫৩) ও অপূর্বোপাখ্যান, এছাড়া ইংরেজিতেও অনুবাদ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র অনুবাদের পাশাপাশি ছাপাঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন৷ তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনুবাদের জন্য বিখ্যাত ছিলেন । এরা প্রত্যেকেই সাহিত্য রচনা, পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রানিত ছিলেন এই শিক্ষিত সম্প্রদায়। শিক্ষা সামাজিক সংস্কার সকল বিষয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। আধুনিক ভারত গঠনে তার ভূমিকা স্বীকার করতে হয়, তিনি সংস্কৃত কলেজের সংস্কার কার্যে হাতদেন সবার প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। একারনেই ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী 'Traditional Modernizer' বলেছেন বিদ্যাসাগরকে, আর তাঁকে ও তাঁর গদ্য সাহিত্য অনুসরনকারীদের সংস্কৃত কলেজগোষ্ঠী বলা যেতে পারে।

টিপ্পনী

আত্মীয় সভা –

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় ও তাঁর সহদররা মিলে একেশ্বরবাদ ধর্মআলোচনার্থে আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহাবিশ্ব জগৎসংসার পরিচালনা করছেন এক সর্বশক্তিমান শক্তির স্বরুপ ঈশ্বর। এই ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা আত্মীয় সভায় পরিবেশন করা হত। সভার সদস্যরা হলেন - প্রখ্যাত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রমুখেরা। জাতপাত নির্বিশেষে সকলেই এই সভায় যোগদান ও আলোচনা করতে পারতেন৷ আত্মীয় সভায় প্রতিদিন বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা আলোচিত হত৷ সাপ্তাহিক অধিবেশন হত সেখানে বেদপাঠ, নানা ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যাবলীও আলোচিত হত। প্রতিমাপূজা, পৌত্তলিকতা পরিহার করে নিরাকার ব্রাহ্মের উপাসনা যে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র স্বীকৃত ধর্ম তা আলোচনা হত। উপনিষদের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করে আত্মীয়সভা প্রচার করেছিলেন। রামমোহনের এমন দোরালে প্রচারে রক্ষনশীলেরা যেমন - উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, সুব্রহ্মনা শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মাঠে নেমে ছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজ –

আত্মীয় সভার পরে একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮২৫ সালে ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা হয়, যার পরবর্তী নাম – ব্রাহ্ম সমাজ (১৮৩০)৷ একেশ্বরবাদের প্রচার ও হিন্দু পৌত্তলিকতা পরিহারের কথা বলা হয় ।বেদান্তকোভিত্তি করে বেদান্তে প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার বিষয় হয়ে উঠল। ব্রাহ্ম সমাজে সকল মানুষের

টিপ্পনী

অবাধ প্রবেশের অধিকার ছিল। অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রীষ্টান সকলের জন্য রাস্তা ছিল খোলা। ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করে জাত পাত বহুধর্মীয় সমস্যা জর্জরিত ভারতবর্ষে বেদান্তের সংস্কারের মধ্য দিয়ে একেশ্বর বাদের প্রচার শুরু করেন। নবভারতের অগ্রদূত রামমোহনের সম্পর্কে ঐতিহাসিক সালাউদ্দিন আহমেদ বললেন – 'তিনি ছিলেন একজন সতর্ক সংস্কারক – উগ্র বিপ্লববাদী নন।' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধনকারী আধুনিক ভারত নির্মানের পথিকৃত রামমোহন রায়।

হিন্দু কলেজ (১৮১৭)-

১৮১৭ সালের ২০ শে জানুয়ারী 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা বাঙালী মানসে বিপ্লব আনল। ২০ জন ছাত্র নিয়ে এই কলেজের সূচনা হয়। দেশীয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত স্রেনী যেমন ছিল তেমনি মিশনারিদের ও সহযোগিতা দেখা যায়। এই কলেজ শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন বাংলার নবজাগরনের ঝড়ের পাখি – লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ক্যাপ্টেন ডি.এল. রিচার্ডসন। ডিরোজিও ও ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে যোগদেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি বিতর্কসভা, ও 'পার্থেনন' নামে একটি পত্রিকা। তাঁর আদর্শ ও কর্মকান্ড ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। বাঙালীর বন্ধ মানসিকতায় এক মুক্তধারা প্রবাহিত হল। এই পথেই 'ইয়ংবেঙ্গল' সম্প্রদায়ের উদ্ভব। ডিরোজিওর ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব ছাত্রদের উপর তার প্রভাব দেখে অভিভাবক ও পাদরিরা বিরাগভাজন হয়ে ওঠায় তাকে হিন্দুকলেজ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। তিনি বাঙলার নবজাগরনের প্রানপুরুষ হয়ে বাঙালী হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। স্বাধীন চিত্তের অধিকারী ছিলেন তিনি, দেশাত্মবোধ ছিল তাঁর প্রবল। কবি ডিরোজিও হিন্দুকলেজে ১৮২৬-৩১ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন।

ক্যাপ্টেন ডি.এল. রিচার্ডসন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে কলেজে যোগদান করেন। তিনি শেকসপীয়রের পাঠ দিতেন ছাত্রদের। নাটক ও নাট্যবিষয়ে ছাত্রদের রসবোধ জেগে ওঠে। ধীরে ধীরে বাঙালীদের মধ্যে আধুনিকতা বোধ ও সাহিত্যবোধ স্চারিত হতে দেখা যায়। বাঙালী জীবন রাজনীতি ও সমাজ বিপ্লবে এই দুই অধ্যাপকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ন। হিন্দুকলেজের ছাত্ররা হলেন – কাশীপ্রসাদ ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ন বসু, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শশীচন্দ্র দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখেরা।হিন্দু কলেজের ছাত্রদের

আবদান সম্পর্কে গোপাল হালদার জানালেন – 'ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের সমতুল্য ছিল (ইং ১৮৩২) হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে অধিকার। রাজনারায়ন বসু আত্মজীবনীতে সে দিনের হিন্দু কলেজের পাঠ বিষয়ের যে তালিকা দিয়েছিলেন তা থেকে বুঝতে পারি – বিদ্যার কী প্রশস্ত বনিয়াদের উপর মাইকেল, ভূদেব, রাজনারায়ন দাড়িয়েছিলেন। তাই, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের এমন প্রশস্ত বনিয়াদ তাঁরা রচনা করতে পেরেছিলেন।'

টিপ্পনী

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় (বেথুন স্কুল ও কলেজ)

এদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে খ্রীষ্টান মিশনারীরাই প্রথম উদ্যোগ গ্রহন করেন। নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কয়েকটি সংস্থা গুরুত্বপূর্ন যেমন- 'কলকাতা স্কুল সসোসাইটি' (১৮১৭), 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (১৮১৯) এবং 'লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' (১৮২৪)। বিভিন্ন কুসংস্কার ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার জন্য এই সব প্রচেষ্টা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। এরপর নারীশিক্ষা উন্নয়নে বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব ও দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করেন। বারত সরকারের আইন সদস্য বেথুন ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় – 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বেথুন কলেজ নামে পরিচিত।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫)

মেকলে মিনিটের পাশ্বাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনের পক্ষে দাবী ওঠে। সেই দাবী সমর্থন করে ১৮৩৫ খ্রীঃ ৭ই মার্চ লর্ড বেন্টঙ্ক ইংরেজি শিক্ষাকে সরকারী নীতি স্বরুপ গ্রহন করেন। পাশ্বাত্য ভাবধারার ফসল কলকাতা মেডিকেল কলেজ। এ সময় শুধু মেডিকেল বিষয়ক নয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়েও কলেজ স্থাপিত হয়েেছিল। সমগ্র বারতের দিকে তাকালে দেখা যাবে – কলকাতায় যেমন মেডিকেল কলেজ, তেমনি রুরকিতে থমাসোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মাদ্রাজে মাদ্রাজ ইউনিভারসিটি হাইস্কুল এবং বোম্বাই এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

বেঙ্গল-ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি(১৮৪৩)

'বেঙ্গল-ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি' একটি রাজনৈতিক সমিতি। শাসন ও রাজনৈতিক

টিপ্পনী

বিষয়গুলি আলোচনা হত এই সভায়। এছাড়া সতীদাহপ্রথা, অ্যাঙলিসিস্ট বনাম ওরিয়েন্টালিস্ট বিতর্ক, নানা রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতবন্ধু মি. জর্জ টমসনকে রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ে আসেন এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির মত এক সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর ১৮৪৩ সালের ২০ শে এপ্রিল তারাচাঁদ চক্রবর্তীর প্রস্তাবে সোসাইটি গঠিত হয়। জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের জন্য এমন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। দেশ বাসীর মঙ্গলসাধন, তাদের রাজনৈতিক, ন্যায়-অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা উত্থাপন ওপ্রকাশ করা হত। বেঙ্গল-ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি, ল্যান্ড-হোলডাস অ্যাসোসিয়েশনের (১৮৫১) রুপলাভ করে। এই সভার সভাপতি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইয়ং বেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়–

হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজে ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক পদে যোগদেন। তিনি নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এবং পার্থেনন পত্রিকা। তার বিদ্রোহী ও দেশাত্মবোধের পথ ধরেই ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের উত্থান। শিক্ষিত তরুন সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্যের অনুকরনে এক তেজোদীপ্ত আন্দোলন ডিরোজিও শুরু করেছিলেন যা রক্ষনশীল হিন্দু সমাজের মূলকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কর্নধার ডিরোজিওর আকর্ষন শক্তি ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বললেন – 'চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষন করে, তেমনি তিনি ও বালকদিগকে আকর্ষন করিতেন। এরুপ অদ্ভুত আকর্ষন, শিক্ষক-ছাত্রে এ রুপ সম্বন্ধ কেহ কখনোও দেখে নাই।'

মনে প্রানে ডিরোজিও ছিলেন ভারতীয়। তাঁর মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের ব্যাপকপ্রভাব যেমন দেখতে পাই তেমনি দেশত্মবোধও ছিল। তিনি যে সম্প্রদায় গড়ে ছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা। এই ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী 'তাঁরা খ্রীষ্টান পাদরীদের গোঁড়ামী, স্ত্রী-পুরুষের অসমানাধিকার, দাসপ্রথা, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রন বিধি, মরিশাসে ভারতীয় কুলি প্রেরন, ভারতীয় বিচার ও পুলিশ ব্যবস্থা, বেগার খাটানো, একচেটিয়া বানিজ্যাধিকার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও অন্যান্য সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।'(ভারতের ইতিহাস – জীবন মুখোপাধ্যায়) ইয়ংবেঙ্গলদের মুখপাত্র হিসাবে ইংরেজি

এনকোয়ারার, বাংলা জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার নাম করা যায়। পরে বেঙ্গল স্পেকটেটর ও ডিরোজিও পন্থীদের হয়ে কাজ করেছিল। এই গোষ্ঠীভুক্তরা সমাজের প্রাচীনতাকে ভেঙে ফেলতে চাইলেন এবং পাশ্চাত্যের প্রবল উন্মাদনাকে বাস্তবে রুপ দিতে চেষ্টা করলেন। তারা প্রত্যেকে ছিলেন সে সময়কার মেধাবী শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের অবদান সম্পর্কে গোপাল হালদার জানালেন – "কিন্তু বাঙলা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁরা ধূমকেতু নন, আশ্চর্য জ্যোতিষ্ক।"

টিপ্পনী

তত্ত্ববোধিনী সভা –

রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরাধিকারী ও ব্রাহ্ম সমাজের পুনরুজ্জীবনের নায়ক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর চেতনার সঙ্গে অন্তগূঢ় ধর্মীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদ। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্থাপিত "তত্বরঞ্জিতসভা", এই সভাটির তৃতীয় অধিবেশনে নাম পরিবর্তিত করে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগিশ নাম রাখলেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। এই সভার মূল কর্নধার দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছিলেন, হিন্দু শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান ও বেদান্তের প্রাচারই ছিল মূল লক্ষ্য। খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের হিন্দু ধর্মবিরোধী প্রচার থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা ও জনগনের আস্থা ফিরিয়ে আনতে তত্ত্ববোধিনীসভা গঠন করলেন। প্রত্যেক মাসে এখানে ধর্মীয় উপাসনা অনুষ্ঠিত হত এবং অধিবেসনে নানা রকম বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করা হত। তত্ত্ববোধিনীসভা বাংলার সামাজিক ইতিহাসে নতুন যুগের প্রবর্তন করল।

দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ব্রাহ্ম সমাজের মূলে সাংগঠনিক সংস্থা হিসাবে গড়ে ওঠে। ১৮৪১ সাল থেকে ব্রাহ্ম সমাজ তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করে। অন্যদিকে এই সভা ব্রাহ্ম সমাজের আর্থিক সংগঠন দেখভাল করতে থাকে। তত্ত্ববোধিনী সভা কখনো ছোট গন্ডীর মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল না। বাংলাদেশের সমগ্র এলিট সমাজকে নিয়ে এই সংস্থা গড়ে ওঠে। সভ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামতনু লাহিড়ী, মদনমোহন তর্কলঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ন বসু প্রমুখেরা। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' এ সময় বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই সভা সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদদের উনিশশতকের বাংলাদেশে ভিক্টোরিয়ান সমাজের বিকাশে সাহায্য করেছিল। এই সমাজ প্রধানত মধ্যবিত্তদের গড়ে ওঠা নতুন চিন্তাভাবনার এক সমন্বয় লক্ষিত হয়।

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সমকক্ষ কোন সংগঠন বাংলাদেশে আর দেখা যায় না। পাশ্চাত্য

টিপ্পনী

সমাজের অন্ধঅনুকরন থেকে বাঙালীকে বাঁচিয়েছিল এই সভা। সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য লালিত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এই সসভার বিশ্বাস ছিল অটুট। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' থেকে কিছু পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন – ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয় কুমার দত্তের – ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, এই সভার পথ ধরে ব্রাক্ষ ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগষ্ট ব্রাক্ষ ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয় কুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগষ্ট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। ব্রাক্ষ ধর্মে প্রচার , প্রসার ও জন সচেতনতা বাড়ানোর সঙ্গে রামমোহন রায়ের লেখার সঙ্গে মানুষের সংযোগ সূত্র স্থাপন ছিল পত্রিকার লক্ষ্য। পরে এই পত্রিকা ব্রাক্ষধর্মের মুখপত্র হয়ে রইলনা জ্ঞানবিজ্ঞান সংস্কৃতির এক পীঠস্থান হয়ে উঠল। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে চর্চার ও কুসংস্কার দূরীকরনের মধ্য দিয়ে সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিল এই পত্রিকা। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র বাগ্মিতায় ও যুক্তিবোধে কেশবচন্দ্র সেন সহ তরুন সম্প্রদায় ব্রাক্ষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের আঘাত থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্য 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন এ উনিশ শতকের ঐতিহাসিক সত্য।

আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন-

ক. উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান কর।

খ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন সম্পর্কে যা জান লেখ।

গ. টীকা – ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। স্কুল বুক সোসাইটি। ব্রাক্ষসমাজ। হিন্দু কলেজ।ইয়ং বেঙ্গল। তত্ত্ববোধিনী সভা।

১.১.৫.বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচনা পর্ব –

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্য প্রধান গেয় সাহিত্য। বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনাসনে মধ্যযুগের সমাপ্তি সূচিত হল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত পাঠকাব্যের পর্যায়ে ধরা হত তা ছাড়া সবই ছিল গেয়কাব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম ও উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বৃটিশ শাসন বাংলার জনজীবন ও অর্থনৈতিক-

সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন আনল। মধ্যযুগের অন্তিমে রাজকার্য পরিচালনা ও নারায়নদেবের চিঠিপত্র ছাড়া গদ্যে লেখা তেমন নিদর্শন আমাদের সামনে নেই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন রামমোহন রায় বাংলা গদ্যে অনুবাদ কর্ম। তর্ক বিতর্ক মূলক লেখা লিখলেন। সংস্কৃত গন্ডী বলেও বাংলার শিক্ষিত জনের লেখার সাধুভাষাকে অবলম্বন করে গদ্য রচিত হল। দুর্বল ভিত্তির উপর প্রথম পদযাত্রা শুরু হলেও পরে তা যুক্তিতর্ক প্রচারের প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। এ কাল বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনার ঐতিহাসিক কালপর্বকেই সূচিত করে।

টিপ্পনী

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠী-

(ক) শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও তার লেখক গোষ্ঠী

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতেই শ্রীরামপুর মিশনের ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কালজয়ী, দুর্জয় সাহসী লেখক গোষ্ঠী বাংলা গদ্য সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলন শুরু করলেন। ভারতের আধুনিক মানুষ রামমোহন ও বাংলা গদ্য ভাষাকে আশ্রয় করে সাহিত্য ও যুক্তি-তর্কের পুস্তিকা রচনা করলেন। শ্রীরামপুর মিশনের কেরি, ওয়ার্ড, সার্শম্যান উদ্যোগে–চার্লস উইলিয়াম ও পঞ্চানন কর্মকারের বাংলা হরফে বাংলা গদ্য কাগজে মুদ্রিত রুপ পেল। গদ্য রচনা-প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

শ্রীরামপুর মিশন–

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা হল। মিশন শুধু ধর্মপ্রচারের কাজে বাঁধা পড়ে পইল না বাংলা ভাষা ও গদ্য চর্চার উদ্ভব ও ইতিহাসে তাদের অবদান নেহাতই কম নয়। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে শিক্ষা-সাহিত্য ও বাঙালীর জীবন ধারাকে নতুন খাতে বয়ে চলার রসদ জোগাল। ইউরোপ থেকে এদেশে মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আগত হয়ে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের সূচনা করলেন। এর মূলে ছিলেন উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যানরা। এরা বাংলায় বাইবেল, বাংলা ভাষা বিষয়ক কিছু রচনা প্রকাশ করলেন যাতে বাংলায় মানুষকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়।

শ্রীরামপুর মিশন প্রথমে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগ দিলেন। তৎসঙ্গে এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে মুদ্রাযন্ত্রকে ব্যবহার করলেন। উইলিয়াম কেরি বাইবেলের অনুবাদ

টিপ্পনী

করেন, ১৮০০ 'মঙ্গল সমাচার জাতিয়ের রচিত', ১৮০১ নিউ টেস্টামেন্ট, পরে চারখন্ডে ওল্ড টেস্টামেন্ট এখানকার মুদ্রনযন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। এছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল মিশন থেকে। মিশনারীরা বুঝেছিল দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা দরকার। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরেজিকে বাদ দিয়ে বাংলায় – উচ্চবিত্ত থেকে সাধারন মানুষের কাছে পৌছানো সম্ভব তা উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় এবং শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা।

বাংলা গদ্যের বিকাশে যে ছাপাখানার ভূমিকা ছিল তা তা মেনে নিয়ে-চার্লস উইলকিন্স ও বাঙালী পঞ্চানন কর্মকারের নাম সর্বাগ্রে বলতে হয়। এই দুই জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ছাপাখানার বাঙলা অক্ষর তৈরী হয়। তিনি শুধু বাংলা নয় হিন্দী অক্ষরও তৈরী করেছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন ও তাদের মুদ্রনযন্ত্র শিক্ষা সাহিত্য ও বাঙালী জাগরনে নবজোয়ার আনল। মিশনই ইংরেজির তুলনায় বাংলা ভাষাকেই প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, ধর্মপ্রচারের জন্য এদেশে আগমন ঘটলেও মিশনারীরা সমাজকল্যান ও শিক্ষা বিস্তারের মধ্যদিয়ে মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট হলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ –

গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশীভাষা। মানুষের আচার ব্যবহার-সংস্কার, আইন কানুন সম্পর্কে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত করে তোলা। ৮ জন অধ্যাপক নিয়ে এই কলেজ গড়ে ওঠে। ১৮০১ সালের ১লা মে কেরী সাহেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বাচস্পতি সহ ছয়জন সহকারীকে নিয়ে বাংলা বিষয়ক বিভাগ তৈরী হয়। কেরী ছিলেন বহুভাষাবিদ-কলেজ তাঁকে বাংলা, মারাঠী ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ করেছিলেন। এ সময় কিছু ধর্মীয় গ্রন্থ ছাড়া পাঠ্য পুস্তক ছিল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর হাতেই গদ্য পুস্তক রচিত হতে থাকে যা বাংলা সাহিত্যে বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বের কাল বলা যেতে পারে।

১৮০১-১৮১৫ পর্যন্ত সময়কালফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। উইলিয়াম কেরী-মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সহ পন্ডিত মুন্সীরা বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করে সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরনীয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের গদ্য গ্রন্থ গুলি নিম্নে উল্লিখিত হল –

উইলিয়াম কেরী –

ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ইংরেজি নয় দেশীয়ভাষায় শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচার করা সহজ তা সাধারনের কাছে গ্রহনীয় হয়ে উঠবে। রামরাম বসুর কাছে তাঁর বাঙলা ভাষা শিক্ষার তালিম। রামরাম বসুর সহায়তায় কেরী 'বাইবেল' অনুবাদ করলেন। পরে-

কথোপকথন – ১৮০১

ইতিহাসমালা – ১৮১২

বাংলা ভিন্ন অন্যভাষাতেও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন – যেমন ইংরেজিতে 'বাংলা ব্যাকরন', বাঙলা-ইংরেজি অভিধান, এছাড়া তার নেতৃত্বে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। 'কথোপকথন' গ্রন্থে ৩১ টি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায় গুলিতে তার মনের যুক্তিবাদিতা ও বাস্তবতায় ফুটে উঠেছে। এই গ্রন্থে ইংরেজ কর্মচারীদের রাংলা শেখানো ও সমাজের সঙ্গে পরিচয় করানোর খাতিরে – খেত-খামার-জমি-চাষাবাদ, মহাজন, ভদ্রলোক, সাহেব, মুনসী, চাকর-বাকর, সামাজিক রীতি নীতি, অনুষ্ঠানের চিত্র তুলে ধরলেন। গ্রাম্য বাংলা গদ্যে উঠে এল –

'ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনুঁ। তাঁর বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি। না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা।'

কেরীর 'ইতিহাসমালা' অনুদিত গল্প সংকলন। ১৪৮ গল্প এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও বাঙলাদেশের বেশিকথা এতে সংকলিত।

রামরাম বসু (১৭৫৭ (আনুমানিক)-১৮১৩)

রামরাম বসু শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিসনের জন টমাসের বাঙলার শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। কেরী সাহেব কলকাতা আসলে তার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন – ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার রচিত গ্রন্থ –

রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র – ১৮০১

টিপ্পনী

টিপ্পনী

লিপিমালা – ১৮০২

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র পাঠ্য মৌলিক গ্রন্থ 'রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র'। এই প্রথম কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবন নির্ভর লেখা প্রকাশ পেল গ্রন্থ হিসাবে। তাঁর গদ্যে সংস্কৃত-আরবী-ফার্সী ভাষার ব্যবহার করেছেন। 'লিপিমালা' গ্রন্থে ৪০ টি লিপি আছে। এই চিঠিগুলি ছোট ছোট বাক্যে পরে পরে বাংলায় কখনো 'রাজা অন্য রাজাকে', 'রাজা চাকরকে',-আসলে এগুলি পত্রিকাতে রাজা পরীক্ষিতের কথা, দক্ষযজ্ঞের কথা, চৈতন্যের কথা ব্যক্ত। এভাবেই তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যকে পথ চলতে সাহায্য করলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (আনুমানিক ১৭৬২-১৮১৯)

তিনি ও বাংলা-সংস্কৃত বিভাগের পন্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি –

বত্রিশ সিংহাসন – ১৮০২

হিতোপদেশ – ১৮০৮

রাজাবলি – ১৮১৭

প্রবোধ চন্দ্রিকা – ১৮১৩

বেদান্ত চন্দ্রিকা – ১৮১৭

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার – প্রথম গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' – সংস্কৃত 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' থেকে গ্রহন করেছেন। তৎসম শব্দের আধিক্য থাকলেও জটিল হয়ে ওঠেনি। 'হিতোপদেশ'-অনুবাদ গ্রন্থ, সংস্কৃতগন্ধী গুরুগম্ভীর চালের গদ্য গ্রন্থ। 'রাজাবলি' সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় 'সংগ্রহ' বলেছেন। এটি বাঙালী রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। এযেন ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখার বৃহত্তর প্রয়াস। 'কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস।' এই গ্রন্থে রাজা ও রাজবংশের ধারাবাহিক বিবরন আছে, সংস্কৃত প্রধান বাংলা গদ্য গ্রন্থটি রচিত।

'প্রবোধচন্দ্রিকা' গ্রন্থটিতে বৈচিত্রময় বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থও সংকলনের নীতিতে রচিত-এতে সংস্কৃত ব্যাকরন, আইন, অলঙ্কার, আইন, জ্যোতিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, রাজনীতি। ইতিহাস, পুরান থেকে বিষয় সংগ্রহ করেছেন। প্রবোধচন্দ্রকাতে-কথারীতি, সাধুরীতি ও সংস্কৃত কালের রীতি মিশ্রন ঘটেছে। বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করে

তার গদ্য লেখার কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর 'বেদান্তচন্দ্রকা' তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত – (এক) কর্মকান্ড (দুই) উপাসনাকান্ড (তিন) জ্ঞানকান্ড। রামমোহনের কালেই 'বেদান্তচন্দ্রকা' প্রকাশিত। রামমোহন বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন।

টিপ্পনী

গোলকনাথ শর্মা – তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ – হিতোপদেশ – ১৮০২,তারিনীচরন মিত্র – ওরিএন্টাল ফেবুলিস্ট, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় – মহারানা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং – ১৮০৫, চন্ডীচরন মুন্সী – তোতা ইতিহাস – ১৮০৫, হরপ্রসাদ রায় – পুরুষ পরীক্ষা – ১৮১৫, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন - পদার্থতত্ত্ব কৌমুদী – ১৮২১, আত্মতত্ত্ব কৌমুদী – ১৮২২

হরপ্রসাদ রায় 'পুরুষপরীক্ষা' নামক গ্রন্থটি বিদ্যাপতির সংস্কৃত 'পুরুষপরীক্ষার' অনুবাদ। ৪টি পরিচ্ছেদে ৫২ টি গল্প আছে। চন্ডীচরন মুনশীর 'তোতা ইতিহাস' হিন্দুস্থানী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এতে ৩৫ টি কাহিনী আছে, এই গ্রন্থে সংস্কৃত প্রভাব থাকলেও সহজবোধ্য।

রামমোহন ও অন্যান্য লেখকগন (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

রামমোহন রায় (১৭৭৪ – ১৮৩৩)

আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়। সমাজ-সাহিত্য-জীবনে তিনিই প্রথম পাশ্চাত্যের যুক্তিনির্ভরতার উপর ভর করে কর্ম পন্থা চালিয়ে গেছেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক নানা প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর মধ্যে সমাজ সচেতনতা, মানবিকতা বোধ, যুক্তিবাদ, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও ব্যক্তিত্ববোধের জাগরনে প্রকাশ দেখা গেল, যে কারনে তাকে নবজাগরনের প্রানপুরুষ বলা হয়। রামমোহন রায় যুক্তিবাদের দ্বারা বৈদিক বহুত্ববাদকে খন্ডন করে ঔপনিষদিক ব্রক্ষবাদকে প্রতিষ্ঠা দেবার লক্ষে ব্রাক্ষধর্ম গড়লেন। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ, বাংলা ছাড়া ইংরেজি, সংস্কৃত, ফারসী, আরবীতেও তার দখল ছিল অসামান্য। সর্ব সাধারনের জন্যই তিনি গ্রন্থ রচনা করলেন। এছাড়া খ্রীষ্টান পাদরীদের হিন্দুধর্ম বিরোধী কথার বিরুদ্ধে মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরেজি ও ফারসীভাষায় পত্রিকার মধ্য দিয়ে উত্তর প্রদান করেছিলেন।

টিপ্পনী

রচনা সমূহ–

বেদান্তগ্রন্থ – ১৮১৫

বেদান্তসার – ১৮১৫

ভট্টাচার্যের সহিত বিচার – ১৮১৭

গোস্বামীর সহিত বিচার – ১৮১৮

প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ – ১৮১৮

কবিতাকারের সহিত বিচার

পথ্যপ্রদান – ১৮২৩

ব্রাহ্মন সেবধি – ১৮২১

সম্বাদ কৌমুদী – ১৮২১

কেনোনিষদ (অনুবাদ)- ১৮১৬

ঈশোপনিষদ (অনুবাদ)- ১৮১৬

গৌড়ীয় ব্যাকরন – ১৮৩৩

ব্রহ্ম সংগীত

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মানুষ। তিনি খ্রীষ্টান পাদরীদের বিরোধীতা স্বরুপ একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিষদ ও গীতা চর্চা করলেন। অনুবাদ করলেন - 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'। বেদবেদান্ত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচনা করলেন 'বেদান্তচন্দ্রিকা' – ১৮১৭ এর পিছনে ছিল পাদরিদের পরামর্শ। সহমরনের বিরোধিতা করে বাংলা গ্রন্থ 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পান্ডব পীড়ন' গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে লিখলেন 'পথ্যপ্রদান'। মৃত্যুঞ্জয়ের গ্রন্থের বিরোধিতা স্বরুপ রামমোহনের - 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' ও পরে 'গোস্বামীর সহিত বিচার' এবং 'কবিতাকারের সহিত বিচার'। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রামমোহনের গুরুত্বপূর্ন রচনা, এই ব্যাকরনই পরবর্তী ব্যাকরন গ্রন্থগুলির পথ নির্দেশিকা স্বরুপ।

রামমোহন রায় তত্ত্ব বিষয়ক গান লিখেছিলেন যা ব্রহ্ম সংগীত হিসাবে পরিচিত। ফরাসীতে ধর্মসংস্কার মূলক গ্রন্থ 'তুহফাতুল মুয়হিদ্দীন'(১৮১৫)। বাংলা, ইংরেজি ও

ফরাসিতে পত্রিকা ও প্রকাশ করেছিলেন। বাংলায় 'ব্রাহ্মন সেবধি', ইংরেজিতে 'Brahmunical Magazine' ও ফরাসীতে 'মীরাতুল আখবার' প্রকাশ করেন রামমোহন। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কারে সর্বক্ষেত্রে তিনি অগ্রনীভূমিকা গ্রহন করেছিলেন একথা বলতে গিয়ে গোপাল হালদার লিখলেন - 'খ্রীঃ ১৮১৫ থেকে খ্রীঃ ১৮৩১ পর্যন্ত কালের মধ্যে কলিকাতায় এমন একটি বড় অনুষ্ঠান বা বড় আন্দোলন হয়নি রামমোহন যার সঙ্গে সম্পর্কিত নন।'

টিপ্পনী

রামমোহনের গদ্য সহজ সরল ভাষা। প্রতিপক্ষকে যুক্তি ও কৌশলে বিদ্ধ করেছেন সেখানে রুঢ়তা কটুশব্দ ব্যবহার করেননি। তাই ঈশ্বর গুপ্ত বলেছিলেন - 'দেওয়ানজী জলের মত বাঙ্গালা লিখিতেন।' সুকুমার সেন জানালেন –

'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহকারী শিক্ষকদের মতো রামমোহন সংস্কৃত ব্যবসায়ী অথবা ফারসী নবীশ ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত জানিতেন, ফারসী এবং আরবী ও সম্ভবত আরও ভালো করিয়া জানিতেন, তিনি ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিতদের অগ্রনী, বহুভাষী রামমোহন স্টাইলের দিকে নজর না দিয়া বক্তব্যের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া ছিলেন। তাই তাঁহার হাতে বাঙ্গালা গদ্যের যে রুপ গঠিত হইল তাহাতে মাধুর্য ছিল না, কিন্তু স্পষ্টতা ছিল, কার্যোপযোগিতা ছিল।'

রামমোহন ছাড়া আরও কিছু বিখ্যাত গদ্য লেখকদের আমরা পাচ্ছি। যেমন – ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্সী জয়নাথ ঘোষ (রাজোপাখ্যায়), প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রমুখ ছাড়াও সেসময় যেসকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও বাংলা গদ্য লেখকদের লেখা প্রকাশিত হত। উইলিয়াম কেরির সুযোগ্য পুত্র ফেলিকস কেরি শারীর সংস্থান বিদ্যা ও শারীরবৃত্ত বিষয়ক বাংলা জ্ঞানকোষ রচনা শুরু করলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে অসম্পূর্ন থেকে যায়, কৃষ্ণমোহন ফেলিকস কেরি ইচ্ছাপূর্ন করার অভিলাষে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামক দ্বিভাষিক গ্রন্থ রচনা করেন।

ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭ – ১৮৪৮)

মার্শম্যান সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'তে নকশা জাতীয় রচনার মধ্যদিয়ে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ। তাঁর রচনাগুলি হল –

নববাবু বিলাস – ১৮২৫

টিপ্পনী

নববিবি বিলাস – ১৮৩১

কলিকাতা কমলালয় – ১৮২৩

গদ্যছাড়া ও প্রদত্ত তিনি কিছু গ্রন্থ লিখেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হটাত বাবু সম্প্রদায়ের পতন – স্খলন মদমত্ত জীবনকে কেন্দ্র করে এই নকশা গড়ে উঠেছে। 'কলিকাতা কমলালয়ে' সমকালীন কলকাতা জীবনের একটা ছবি তিনি দেগে গেছেন। নবউদ্ভিন্ন বাবুদের বিবিদের নিয়ে রচনা করলেন 'নববিবিবিলাস।'

আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন –

ক. বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগনের পরিচয় দাও।

খ. গদ্য শিল্পে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান নিরুপন কর।

গ. ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গদ্য সাহিত্যের পরিচয় প্রদান কর।

১.১.৬. বাংলা সাহিত্যের গতিবিধানে সাময়িক পত্র পত্রিকা, (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাময়িক পত্র-পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িক পত্র পত্রিকার যেমন অবদান তেমনি সংস্কৃতি, সমাজ সংস্কার, সাহিত্যেক দিককে জনসমাজে তুলে ধরার হাতিয়ার হয়ে উঠল এই পত্র পত্রিকা। দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সমসাময়িক ঘটনা ধারা তার প্রতিফলন নতুন নতুন লেখক গোষ্ঠার আবির্ভাব থেকে বাঙালির ইতিহাস চর্চা, রাজনীতি স্থান পেল সাময়িক পত্র পত্রিকায়।

আধুনিক বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনার প্রকাশ সাময়িক পত্রপত্রিকায়। ১৮১৮ খ্রীঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রকাশিত 'দিগদর্শন' বাংলা সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়ে সাময়িক পত্রের যাত্রাপথ সূচিত হল। মুদ্রন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে গ্রন্থ, সংবাদপত্র ছাপানোর ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লব আনল। পাশ্বাত্যের সংবাদ পত্রের অনুসরনেই এদেশে মুদ্রনযন্ত্র স্থাপিত হল। শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজাগরনের আগমন

ঘটল। ১৭৮৯ খ্রীঃ আগস্টাস হিকি সাহেব কর্তৃক 'বেঙ্গল গেজেট' বাংলা তথা ভারতের মুদ্রিত প্রথম ইংরেজি সংবাদ পত্র ও পরমপ্রাপ্তি বাংলার বুকেই ঘটেছিল। অবশ্য দুবছর সময়কালের মধ্যে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

টিপ্পনী

'বেঙ্গল গেজেট'এর পদাঙ্ক অনুসরনে কয়েকটি পত্রিকার উদ্ভব ঘটেছিল, যেমন - 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', হরকরা প্রভৃতি। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে গভর্নমেন্ট পত্রিকাগুলির উপর আশির্বাদের হাত রাখেনি। ইংরেজের শাসন শোষন যাতে প্রকাশ না পায় তাই পত্রিকাগুলির কন্ঠরোধের জন্য ১৭৯৯ খ্রীঃ লর্ড ওয়েলেসলি সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা খর্ব করেন। এর পরবর্তীতে ১৮১৮ সালে লর্ড হেস্টিংস সম্পাদকদের জন্য সাধারন নিয়মনীতি বেঁধে দিলেন।

শ্রারামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮১৮ বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম মাসিক পত্রিকা দিগদর্শন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল সংবাদ পরিবেশ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা। দিগদর্শনের ঐতিহাসিক প্রকাশের পর মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল - 'সমাচার দর্পন'। ১৮১৮ খ্রীঃ ২৩মে প্রকাশিত সাপ্তাহিক এই পত্রে পরিবেশিত হল – দেশ-বিদেশের আবিষ্কার, শিল্প-সাহিত্য, সাহেবদের নানা খবর। সামাজিক বিষয় হিসাবে উঠে আসল – জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু জনিত সংবাদ সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। মাঝপথে পত্রিকাটি সপ্তাহে দুবারও প্রকাশিত হতে থাকে ১৮৩৪ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত পুনরায় সাপ্তাহিক হিসাবেই প্রকাশিত হয়।

বাঙালী পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র কলকাতা থেকে প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেট'। প্রকাশের কাল ১৮১৮ খ্রাষ্টাব্দে, প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হত। সাধারন মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে সহজ সরল বাংলায় নানা সংবাদ প্রচারিত হত। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য শ্রীরামপুর মিশনেই মুদ্রনের সমস্ত পাঠ নিয়েছিলেন। তারপর স্বাধীনভাবে এই 'বাঙ্গাল গেজেট' প্রকাশে ব্রতীহন। পরবর্তী বছরে দ্বিভাষিক খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক প্রচার পত্রিকা 'গসপেল ম্যাগাজিন' প্রকাশিত হয় ১৮১৯ সালে। খৃষ্টতত্ত্ব বিষয়ক প্রচার মূলক পত্রিকাটির প্রকাশক হিসাবে Baptist Auxiliary Missionary Society নাম পাওয়া যায়।

১৯২১ খ্রাষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় - 'ব্রাক্ষন সেবধি', 'সম্বাদ কৌমদী', মত পত্রিকা।'ব্রাক্ষন সেবধি' পত্রিকাটি শিবপ্রসাদ শর্মার নামে প্রকাশিত হলেও প্রকৃত লেখক ছিলেন রামমোহন রায়, 'সমাচার দর্পনে' হিন্দু শাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, অসারতা নিয়ে আলোচনা

টিপ্পনী

করা হত এরই প্রতিবাদে 'সম্বাদ কৌমদী'র জন্ম। ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচাঁদ দত্ত যৌথভাবে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন, তবে ১৮২১ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর প্রথম রামমোহন রায় প্রভৃতি হিন্দু নেতাদের পরিপোষনে প্রকাশিত হয় হিন্দুদের মুখপত্র সম্বাদকৌমদী।

মাসিক 'পশ্বাবলী' এবং সাপ্তাহিক 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকা দুটি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি জীবজন্তু বিষয়ক এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাক সঙ্গে যুক্ত ব্যাক্তিগন হলেন – পাদরী লসন, W.H. Pearce এবং পরবর্তী পর্যায়ে রামচন্দ্র মিত্র। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রকাশক হলেন ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়। সহমরন বিষয়ক ব্যবস্থার আলোচনা থেকেই ভবানীচরনের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী' ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া রক্ষনশীল পন্থীর মানুষ। তাই নিজে 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন ১৮২২। পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক-দ্বিসাপ্তাহিক এবং পরে প্রাত্যহিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৮২১ সালের মে মাসে শ্রীরামপুর মিশন থেকে একটি মাসিক সমাচারপত্র 'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' প্রকাশিত হয়।

১৮২৩ সালে সম্বাদ তিমিরনাশক নামক সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়, ১৮২৯ সালে নীলরতন হালদার সম্পাদিত 'বঙ্গদূত' প্রকাশ পায়। এই বছরই রক্ষনশীলদের 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা' এবং 'ব্যবহার দর্পন' প্রকাশ পায়।

১৮৩১ সালে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। এই পত্রিকাটি প্রথমে সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশ পেলে ও ১৮৩৬-১০ই আগষ্ট দ্বি-সাপ্তাহিক এবং ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন থেকে দৈনিক প্রকাশিত হতে থাকে 'সংবাদ প্রভাকরই' দৈনিক সংবাদ পত্রগুলির অগ্রদূত যার পথ অনুসরনে আধুনিক দৈনিকের পথ চলা। ১৮৩১ সালে প্রেমচাঁদ রায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক-'সম্বাদ সুধাকর' এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপাত্র 'জ্ঞানান্বেষন' প্রকাশিত হয়, ডিরোজিও পন্থী দের দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন এর সম্পাদক, নবজাগরনের যুগে এ পত্রিকাক ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ন।

১৮৩২ সালে-ভোলানাথ সেনের 'অনুবাদিকা' প্রকাশ পায়। এছাড়া, বিজ্ঞান সেবধি, দলবৃত্তান্ত, সংবাদ রত্নাবলী প্রকাশ লাভ করে। ১৮৩৭ কালীশঙ্কর দত্তের সম্বাদ সুধাসিন্ধু, ১৮৩৮ সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী, সংবাদ দিবাকর প্রকাশ পায়। ১৮৩৯ সালে শ্রীনাথ রায় সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশিত হয়। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের - 'সম্বাদ রসরাদ' এটি তার পরিচালিত পত্রিকা।

১৮৪৩ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' মাসিক পত্রিকাক প্রকাশ ঘটে। এর পিছনে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটি সাহিত্য-বিজ্ঞানের এক সমৃদ্ধ পত্রিকা। ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত পত্রিকাগুলিহল - 'সংবাদ রাজরানী', 'কায়স্থ কৌস্তভ', পস্থীর বিবরন প্রভৃতি।

টিপ্পনী

পাষন্ডপীড়ন (সাপ্তাহিক) এবং মাসিক 'জগদ্বন্ধু'-১৮৪৬ সালে প্রকাশিত। ১৮৪৭ সালে পাচ্ছি – উপদেশক, সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন, সংবাদ কাব্যরত্নাকর, সংবাদ সাধুরঞ্জন, সংবাদ মনোরঞ্জন, জ্ঞান-সঞ্চারিনীর মত পত্রিকাগুলি। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানচন্দ্রোদয়, পাক্ষিক 'সংবাদরত্নবর্ষন', সংবাদ অরুনোদয়, সংবাদ দিনমনি প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ পায়।

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ে সম্পাদনায় ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত হল 'সংবাদরসসাগর'। অবশ্য কবি রঙ্গলাল বন্ধ্যোপাধ্যায় ও এই পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৮৪৯ সালে আরো কিছু পত্রিকাক সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন – সাপ্তাহিক 'বারানসী চন্দ্রোদয়', মাসিক সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা, দৈনিক 'মহাজন দর্পন', কৌস্তভ কিরন প্রভৃতি। ১৮৫০ সালে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি হল – দূরবীক্ষনিকা, সত্যার্নব, সর্ব্বশুভকরী, সংবাদ বর্দ্ধমান, ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিকা – প্রভৃতি পত্রিকাগুলি।

এইভাবে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির সাহিত্য, সমাজ-ইতিহাস, রাজনীতির বিচার বিশ্লষন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোকময় অধ্যায়ের সূচনা করল।

আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন-

ক. সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'দিগদর্শন' থেকে 'বঙ্গদূত' পর্যন্ত পত্র পত্রিকাগুলির পরিচয় দাও।

খ. 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১.১.৭. রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : প্রাথমিক প্রয়াস

উনবিংশ শতকে নগরজীবনের বিনোদনে শিক্ষতজনেদের মধ্যে নাটক অভিনয় ও মঞ্চস্থ করার প্রয়াস দেখা গেল। যাত্রা, পঁচালী, টপ্পা, খেউড়ের স্থানে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় উপভোগ করার মানসিক পরিবর্তন দেখা গেল। বাংলাদেশে প্রথম হেরাসিম লেবদেভ

টিপ্পনী

সাহেব ১৭৭৫ সালে রুশদেশ থেকে এসে 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে কলকাতায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। এই প্রথম 'The Disguise' (কাল্পনিক সংবদল) ও Love is the Best Doctor অনুদিত হয়ে ডোমতলা লেনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল। লেবেদেভ সাহেবের এই প্রয়াস বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে যে আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন তা ধীরে ধীরে মহীরুহে পরিনত হয়। এই রুশীয় প্রথম আমাদের অভিনয় সম্পর্কে সচেতন করে আলোড়ন ফেলে দিলেন।

ইংরেজ সাহেবদের প্লে হাউস, পরে 'বেঙ্গলী থিয়েটার' কলকাতার সম্ভ্রান্ত ধর্মী শিক্ষিত বাঙালী মনে নাট্যশালা তৈরির পথ প্রস্তুত করেদিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রথম বাঙালী 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চ ও নাটক অভিনয়ের বিস্তারে সাহায্য করেছিলেন। 'হিন্দু থিয়েটারে' ইংরেজি নাটকের অভিনয় পরিবেশিত হয়েছিল। ১৮৩৫ সালে নবীন বসুর বাড়িতে বাংলায় ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হল। বাংলা নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ আকর্ষন দেখা গেল। কিছু দিনের মধ্যে একে একে বঙ্গরঙ্গনাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হল। পাশ্চাত্য প্রভাব পুষ্ঠ এই নাট্যশালার প্রতি সম্ভ্রান্ত-শিক্ষিত ধনী পরিবার নিজেদের উদ্যোগে বাড়িতে নাট্যশালা স্থাপন করলেন।

দেশী রঙ্গালয়ের বিস্তারের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিদেশী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন – ওল্ড প্লে হাউস- এটি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা, এই নাট্যশালা ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত। তার সময়কাল জানা যায় না। তবে ১৭৫৬ সালে সিরাজদৌল্লার আক্রমনে রঙ্গালয়টি বিনষ্ট হয়েছিল।

জর্জ উইলিয়ামস্ প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার- 'দি নিউ প্লে হাউস' বা ক্যালকাটা থিয়েটার। ১৭৭৫ সালে রাইটার্স বিল্ডিং এর পিছনে রঙ্গালয়টির অবস্থান ছিল। বৃটেনের বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিকের উপদেশে এই নাট্যশালার দৃশ্যপট ও সজ্জা গ্রহন করা হয়েছিল। ইংরেজ অভিনেতা ও অভিনেত্রী এখানে অভিনয় করতেন। মিসেস ব্রিস্টো প্রতিষ্ঠিত 'মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার' ১৭৮৯ সালে উদ্বোধন হয়। মহিলা পরিচালিত প্রথম কলকাতায় ইংরেজি থিয়েটার। এখানে 'পুত্তর সোলজার' নামক নাটকটির প্রথম অভিনয় সৌভাগ্য লাভ করে। পরে 'সুলতান', প্যাডলক নাটক এই মঞ্চে অভিনীত হয়। ১৭৯৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'হোয়েলার প্লেস থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ১৮১২ সালে ৩০ শে মার্চ মি. মরিস প্রতিষ্ঠিত 'এথেনিয়াম থিয়েটার' আত্মপ্রকাশ করে। এই থিয়েটারে অভিনীত নাটকগুলি -

'আর্ল এফএসেক্স', 'রেজিং দি উইন্ড', হ্যামলেট প্রভৃতি। 'এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করলেন - 'চৌরঙ্গী থিয়েটার'। উদ্বোধনের সময় কাল ২৫ নভেম্বর ১৮১৩, এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন – H.H. Wilson, P.L. Richardson, এরমত ব্যাক্তিবর্গ এবং বাঙালী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

চার্লস ফ্রাঙ্কলিং পরিচালিত 'দমদম থিয়েটার' ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মাত্র সাত বছর এই থিয়েটার সচল ছিল। এই মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলি হল - 'রাইভ্যালস', ব্রোকসসোর্ড, দি হানিমুন প্রভৃতি। ১৮২৪ সালে কলকাতায় 'বৈঠকখানা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে সে সময়কার বিখ্যাত অভিনেত্রী ও অভিনেতারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অভিনীত বিখ্যাত নাটকগুলি হল – রেজিং দি উইন্ড, দি ইয়ং উইডো, দি লাইং ভ্যালেট ইত্যাদি। ১৮৩৯ সালের ২১ আগষ্ট 'সাঁ সুসি থিয়েটারের' আবির্ভাব ঘটল। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন– স্টোকলার এবং মিসেস লীচ। পরে পার্কস্ট্রিটে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরী হলে – স্টোকলার ও মিসেস লীচের সঙ্গে যুক্ত হলেন মি. কলিনস। এই থিয়েটারে পরিবেশিত নাটক গুলি হল - 'ইউ কান্ট ম্যারি ইওর গ্রান্ডমাদার', প্রহসন - 'বাট হাউ এভার', 'মাই লিটল এডপটেড', 'ফেয়ারওয়েল' প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটক, এই সময় আরো কিছু রঙ্গালয়ের সন্ধান পাওয়া যায়– বিদেশী থিয়েটার গুলি হল - 'জুভেনাইল থিয়েটার' – ১৮৪৮, দি এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি, হাডসন ড্রামাটিক কোম্পানী প্রভৃতি।

১৮০০-১৮৫০ সাল পর্যন্ত বিদেশী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল এবং বিদেশী নাটকের অভিনয়ই ছিল মুখ্য। এই নাট্যশালা গুলিতে বিদেশী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয়ে আসর জমে উঠত। সবই কলকাতাকে কেন্দ্র করে সাহেবদের বিনোদনের এই থিয়েটার তৈরির প্রচেষ্টা। এসময় সাধারন মানুষ যাত্রা – ঘেউড়। লোকনাটক, কীর্তনে মানুষ মুগ্ধ ছিল। নবযুগের সূচনায় বিদেশীদের উৎসাহে বাংলাদেশে নাট্যচর্চার শুরু ও নাট্যশালার বিকাশ সাধন। লেবডেফের বাংলা নাটকের পরিবেশন পরে প্রসন্নকুমারের 'হিন্দু থিয়েটার', নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় শিক্ষিত বাঙালীকে নাটক দেখা ও নাটক রচনাতে উদ্দিপীত করে তুলল। এভাবেই ১৮৫০ পর্যন্ত অনুবাদের মধ্য দিয়ে মানুষের নাট্যরস আস্বাদন করতে দেখা গেল। পরবর্তীকালে বাঙালী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও মৌলিক ও অনুবাদ নাটক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের বিকাশ সাধিত হল। যে ধারা, হরেন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, জে.সি. গুপ্তে। তারাপ্রসন্নর হাত ধরে বামনারায়ন, মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটল।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

১.১.৮. কবিওয়ালা, কবিগান ও কবিতার উন্মেষকাল

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থির হয়ে উঠল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুতে মধ্যযুগের অবসান এবং বাংলার প্রাচীন কাব্যধারা লুপ্ত হল। এমনই এক ভাঙাগড়ার ক্রান্তিকালে ফরাসী বিপ্লব ও ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিকতার জাগরন শিক্ষিত সমাজকে চঞ্চল করে তুলল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কবি গানের আসর মাতালেন বিখ্যাত কবিওয়ালারা রাতের আঁধার বিদীর্ন করে। লালচন্দ্র নন্দলাল থেকে নিধুবাবুরা প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন। কবিগান ও কবিওয়ালাদের সম্পর্কে পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জানালেন – 'অষ্টাদশ শতকের শেষাধ এবং ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে কবিগান এবং তারি আনুষাঙ্গিকরুপে টপ্পা, পাঁচালি প্রভৃতি নাগরিক লৌকিক কাব্যই সূর্য-চন্দ্র-বিবর্জিত বাঙলা কাব্যের তমসাচ্ছন্ন নৈশগগনে নক্ষত্রের দীপ্ত নিয়ে বর্তমান ছিল।'

কবিগান – গান ও কবিতা যা বাদ্য যন্ত্র সহযোগে আসরে পরিবেশিত হত। এছাড়া টপ্পা, আখড়াই, হাফ আখড়াই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করল। নিধুবাবু (১৭৪২ – ১১৮৩৯) আখড়াই এর উদ্যোগক্তা যেমন ছিলেন তেমনি হিন্দুস্থানী গান ভেঙে দিয়ে টপ্পা গানের প্রচলন শুরু করেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর যে টান ছিল তা একটি গানে –

নানা দেশে নানা ভাষাবিনে স্বদেশীয় ভাষে পুরে কি আশা।

নিধুবাবুর সমবয়সী শ্রীধর ও কবিগানের আসরে যোগ দিয়েছিলেন। রামবসু, দাসরথি রায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মধুকাস ছিলেন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল।

আধুনিক সাহিত্যের মূলবিষয় সেই মানুষেরই গীত গাওয়া হত কবিগানে। কবিগান জন্মসূত্রে নগর কেন্দ্রিক সম্পদ। কবিওয়ালাদের সাহিত্য মূল্য নিয়ে সমালোচকগনের মধ্যে নানা মতামত দেখা যায়। কবিগান মৌখিক সাহিত্য যাতে রাধাকৃষ্ণ লীলা ও ভবানী বিষয়ক বিষয় বর্তমান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে মাধুর্যভাব বা ঈশ্বর্যভাবের মধ্যে ব্যক্তি মানবের আবেদন বেশ ফুটেছে –

'তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা আমার দয়া করলে না মা,

পাষানে প্রান বাঁধলে উমা, মায়ের ধর্ম-

এই কি মা?'

রামবসু কণ্ঠে – 'সাধ করে করেছিলাম দুর্জয়মান

শ্যামের তায় হল অপমান।'

শেষ পর্যায়ের কবিয়ালদের মধ্যে ঘেউড় ও আদিমত অনেক তিরোহিত হয়ে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় উদারতার প্রকাশ দেখা যায়, এই পটে বাগবাজারের ভোলাময়রা ও অ্যান্টনিফিরিঙ্গি উল্লেখযোগ্য, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির বিখ্যাত কবিগান –

কৃষ্টে আর খ্রীষ্টে কিছু তফাৎ নাইে ভাই,

আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে

ঐ দেখ শ্যামা দাঁড়িয়ে আছে

আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙা চরন পাই।

কবিওয়ালাদের কবিগানকে আধুনিক সাহিত্যের কবিতায় সমকক্ষ বলাচলে না। তবে সব কিছু মিলিয়ে কবিগান বাংলার বিশেষ সম্পদ নিসন্দেহে বলা চলে।

১৭৬০ সালের পর অর্থাৎ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর মধ্যযুগের অবসান বলে ধরে নেওয়া হয়। এই সময়কাল রাজনীতি, আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে এক অবক্ষয় দেখা দিল। অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে বাংলার পথ চলা। বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কোন উৎকৃষ্ট নিদর্শন আমরা পাচ্ছিনা। তবে গানের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ তার মনোরঞ্জনের ক্ষুঁদকুড়ার সন্ধান পেল। গ্রাম বাংলার জীবন থেকে উঠে আসল লোকগীতি, বাউল, সারি-জারির মত নাটির গান। নগরে বসবাসকারী ধনিক শ্রেনী বাবুদের মনোরঞ্জনার্থে গ্রামীন জীবন থেকে উঠে আসা- কবিগান, আখড়াই, ঘেউড়, হাফ আখড়াই, পাঁচালি স্থান করে নিল। ইংরেজ সংস্পর্শে আসা নব বাবুসম্প্রদায়ের কাছে কবিগানই প্রধান হয়ে উঠল। তখন বাংলা কবিতার স্থায়ী রুপলাভ করেনি এই গানের মধ্যে তার প্রান ভোমরা ছিল লুকিয়ে। কবিগানের আসর থেকে যাযা তুলে দাঁড়ালেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় যেমন কবিওয়ালাদের উত্তরাধিকার ও প্রাচীন জীবনের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করি, তেমনি ইংরেজ প্রভাবিত নব চেতনার অভিঘাতে ভাঙতে থাকে তার হৃদয়তট।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণবপদাবলী, অনুবাদ ও জীবনী সাহিত্য, প্রভৃতির হাত ধরে পয়ারের ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতার ইতিহাস এসে দাঁড়াল উনিশ শতকের নবজাগরনের সন্ধিক্ষনে। মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র থাকলেও তা ছিল 'গেয়' কাব্য ভুক্ত। ব্যতিক্রম 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত'-গের এবং পাঠ্য দুটি ভাবেই বয়াস্বাদন করা সম্ভব হল। দৈব নির্ভর সাহিত্য রচিত হত যেয়ুগে তবে অনুবাদ সাহিত্য শাখায় রোসাঙ রাজদরবারের মুসলিম কবিরা তাদের কাব্যে মানবরস আনয়ন করলেন কাব্য কে করে তুললেন মানবতাবাদী। আমরা আধুনিক গীতিকবিতার বিরল প্রকাশ পাচ্ছি বৈষ্ণবপদাবলীতে। একথা ঠিক যে, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হয়ে ঈশ্বর গুপ্তের হাত ধরে বাংলা কাব্য কবিতার সূত্রপাত।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-৭৮), ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯) কবিওয়ালার ধারাকে বহন করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা রচনা থেকে পরবর্তী কবিরা কবিতা লেখার উদ্দীপনার রসদ পেয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর 'সংবাদ-প্রভাকর' যে নতুন কবি গোষ্ঠী তৈরী তে সাহায্য করেছিল সে বিষয়ে সুকুমার সেনের মন্তব্য –

'কবিতা রচনা ঈশ্বর গুপ্তের সখের ব্যাপার ছিল না, ইহাতে তাঁহার অন্তরের টান ছিল, তিনি কবিতা ভালবাসিতেন, কবিতা রচনা তাঁহার অতি সহজেই আসিত এবং যদি ও সংবাদপত্রসেবা তাঁহার পেশা ছিল তথাপি গদ্য রচনায় তাঁহার লেখনীর গতি কখনই অকুণ্ঠিত ও সুললিত ছিল না, এককথায় কবি ঈশ্বর গুপ্ত গদ্য লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার কবিতাপ্রীতির আরও একটা বড় প্রমান আছে। তিনি কবি তৈয়ারি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের নবীন পদ্য রচনা ছাপিবার জন্য তাঁহার পত্রিকা 'সংবাদ-প্রভাকর' সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। আধুনিক কালের ভারতবর্ষে কবিতা-স্কুলের বা কবি-মন্ডলীর প্রথম গোষ্ঠীনীতি বলিয়া ঈশ্বর গুপ্তের নাম স্মরন করিতে হইবে।'

ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে এক দিকে আধুনিক যুগের প্রতি আকর্ষন অপর দিকে প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি টান দেখা যায়, যার ফলে কবিতায় তার প্রভাব পড়েছে। তিনি এক যুগসন্ধির কবি তাঁর কবিতায় ব্যঙ্গের ছলে উঠে আসে –

যত ছুঁড়ী গুলো তুড়ী মেরে,

কেতার হাতে নিচ্ছে যবে,

তখন 'এ,বি', শিয়ে বিবি মেনে,

বিলাতী বোল কবেই করে,

তাঁর মধ্যে দেশপ্রীতির পরিচয় আমরা পাই-

জান না কি জীব তুমি জ্ঞানী জন্মভূমি,

যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।

কালীপ্রসাদ ঘোষ তিনি প্রথম বাঙালী যিনি কবিতা লিখেছিলেন ইংরেজিতে। পরবর্তী কালে বাংলা ইংরেজিতে কবিতা রচনা করলেন- মধুসূদন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখেরা।

আদর্শ প্রশ্নাবলী –

ক. ঊনবিংশ শতকে প্রথমার্ধের বাংলায় সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিচয় দাও।

খ. বাংলা দগ্যসাহিত্য বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের অবদান লেখ।

গ. বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

ঘ. ১৮০০ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাস বর্ননা কর।

ঙ. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক প্রয়াস সম্পর্কে আলোকপাত কর।

চ. কবিওয়ালা ও কবিগান এক সময় বাংলার আকাশ-বাতাস মথিত করেছিল – তা আলোচনা করে দেখাও।

ছ. টীকা – ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু কলেজ, বেঙ্গল-ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি, নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়, তত্ত্ববোধিনী সভা।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

১.১.১০.সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের রুপরেখা – গোপাল হালদার।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – সুকুমার সেন।

·বাংলা সাহিত্য পরিচয় – ৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

·বাংলার সাহিত্য ইতিহাস – সুকুমার সেন।

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ন ইতিবৃত্ত – অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতের ইতিহাস – জীবন মুখোপাধ্যায়।

বারতের ইতিহাস – অতুলচন্দ্র রায়।

বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস – স্বপন বসু।

আধুনিক ভারত – প্রনবকুমার চট্টোপাধ্যায়।

Modern India – Bipan Chandra

দ্বিতীয় একক ১৮৫১ - ১৯০০

টিপ্পনী

২.১ ভূমিকা

সময়ের সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও দেশ কালের মানসিকতা। উনবিংশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি সাধন। আরতবর্ষের মানুষের রাজনতিকক সচেতনতা বৃদ্ধি দেখা গেল। পূর্ববর্তি সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রভাব মানবতার জন্ম দিল। বাংলার মানুষের মুখে ভাষা ও হৃদয়ে আশা আশ্বাস জাগ্রত হল। বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ সরকারের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও সংগ্রামে যুথবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জাগল। এর পিছনে ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার জ্ঞান বিজ্ঞান ও নব আবিষ্কারের সুফল। উডের ডেসপ্যাচ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন পত্র-পত্রিকায় জনগনের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে লাগল। ধর্মীয় নেতাদের সংস্কার উদার মানবতাবাদ ও দেশ মাতৃকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাজনৈতিক নেতাদের উত্থান ও সভাসমিতি গঠন এবং আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বাঙলার সৃষ্টি মুখর ভূমিকে উর্বর করল।

বাঙালি মানসে সংস্কৃতি, রাজনৈতিক দিক দিয়ে সাড়া মিলল অভূতপূর্ব। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটল এই পর্বে। তাদের যেমন ছিল দেশাত্মবোধ তেমনি ছিল সমাজকে নতুন করে গড়ার চিন্তা। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেম-নবীন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের মর্যাদা দান করল।

২.২ উদ্দেশ্য

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক উত্তাল পর্ব বলে মনে হয়। শিক্ষা - সংস্কৃতি সমাজ রাজনীতির এক প্রবল দ্বন্দ সংঘাতময় কালপর্ব। ইংরেজ শাসন, তার বিভিন্ন নির্দেশ নামা নেমে আসছে ভারতবাসীর উপর। অপরদিকে পাশআত্য শিক্ষার আলোয় মানুষের চিন্তা চেতনার আলোয় চোখ গেছে খুলে। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কারের বেড়াজাল ধীরে ধীরে হয়ে পড়েছে শিথিল। এবং রাজনৈতিক চেতনা

টিপ্পনী

তাদেরকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাঙলার শিক্ষিত মানুষ, সৃষ্টিশীল চেতনাউন্মুখ মানুষ নাট্যসাহিত্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস। কাব্য কবিতা পত্র পত্রিকার মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বকীয়তার পরিচয় প্রদান করলেন। এই এককটিই পাঠে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো-

- বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস।
- ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট।
- বাংলার সাহিত্যে আধুনিক গতিধারা।
- বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গতিধারা।
- বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাস।
- কথা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিস্তৃতি।
- মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্য কবিতার ইতিহাস।
- ১৮৫১-১৯০০ সাল পর্যন্ত সাময়িক পত্র-পত্রিকার হাল হদিশ।
- রঙ্গমঞ্চ, নাট্যশালা ও নাট্য সাহিত্যের বিস্তৃত পর্ব।

২.৩ বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতক ইতিহাস

পাশ্চাত্যের শিক্ষা সংস্কৃতি বিপুল প্রভাব ভারত তথা বাংলা দেশের মাটিতে আছড়ে পড়ল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায় র্ধ, দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা চেতনায় বাংলা দেশের সমাজ - সংস্কৃতিকে নতুন চেতনায় জাগাতে চেষ্টা করলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরেজিও ও দেবেন্দ্রনাথের পথ ধরে সমাজ-সংস্কৃতির জাগরণ ঘটল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চিমী ধ্যান ধারনায় পুষ্ঠ হয়ে অন্ধবিশ্বাস, আচার, কুসংস্কারের জায়গায় যুক্তিশীল, প্রগতিশীল ধ্যান ধারনার জন্ম নিল বাংলা ভূমিতে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের এই ধারা দ্বিতিয়ার্ধে বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে বেশি করে আলোড়ন ফেলল, আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহনের যুক্তিবাদ, বিদ্যাসাগরের যুক্তি ও সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও শিক্ষার দ্বীপ

সাধারনের সামনে তুলে রে বঙ্গের সংস্কৃতি ও চেতনা লোককে শক্ত ভিতের উপপর বসালেন।

টিপ্পনী

বিদ্যাসাগর১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হলেন এবং শ্রাব্য ও পাশচাত্য ভাবধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে আধুনিকতার স্বপ্ন দেখালেন। সকল দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যিকে উন্নত স্তরে পৌঁছানো এবং মাতৃভাষাকে গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরলেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবর্তন ও বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তুললেন। এ সকল বিষয় প্রবর্তন করা সে সময় সমাজে সহজ ছিল না। গোঁড় হিন্দু পন্থীরা এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললে ও শেষ পর্যন্ত হার মেনেছে। বিদ্যাসাগর নিজে বলেছেন - "বিধবা বিবাহ প্রথা প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।" উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন ধরলে কেশবচন্দ্র সেনের আগমন ঘটল। নতুন তরুন সমাজ তার সঙ্গে যোগদানের ফলে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্য পদে আসীন হয়। দেশের ও সমাজের বহু কল্যানকামী আন্দোলন গড়ে তোলেন যেমন - আরী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষার বিস্তার, বিধা বিবাহ, অসবর্ন বিবাহের শ্রমিক কলানের পক্ষে রায় দান ও অস্পৃশতা ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে গর্জে ্ঠেন। এ সময় কিছু সভার জন্ম হয় - 'ব্রাহ্ম বন্ধু সভা' (১৮৬০), ক্যালকাটা কলেজ (১৮৬২), রামাবোধিনী সভা (১৮৬৩), ব্রাহ্মিকা সমাজ (১৮৬৫)।

ভারতের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ইতিহাসে মানবতাবাদী যতমত ততপথ এর প্রবক্তা পরমহংসদেবের বৈপ্লবিক উপস্থিতি। সাধনা, আধ্যাত্মিকতার নতুনপথ দেখালেন সংকীর্নতা মুক্ত যুগপুরুষ। ধর্মসম্পর্কে মানুষের চিন্তা চেতনার জাগরণ ঘটল সেই পথ ধরে। যুগবতারের সার্থক উত্তরাধিকারী যৌবন ও দেশপ্রেমের মূর্তপ্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে। পরানুকরন, পরমুখাপেক্ষী, দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতা, অশিক্ষা জাতিভেদ ও সমস্ত বিভেদ ভুলে শাশ্বত হিন্দুধর্ম ও ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর কল্যানের জন্য জীব সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সেবার কথা শোনালেন। এবং Manmaking এবং Character Bilding এর উপর জোর দিলেন যাতে প্রকৃত মানুষ গড়া যায়। দেশ সেবার মধ্যদিয়ে দেশ প্রেমিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন' প্রতিষ্ঠারে মধ্য দিয়ে সেই চিন্তা ধারা প্রবহমান।

বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতির জগতে নতুন নতুন লেখকগনের আবির্ভাব ঘটল।

টিপ্পনী

যারা বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃিকে আধুনিকতার ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে বিশ্বমানের উৎকর্ষতার পরিচয় প্রদন করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রমুখের মত লেখকরা এই শতকে উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তিত্ব।

সমগ্র ভারতবর্ষের নিরিখে বাংলার ভূমি থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজ সংস্কারের অগ্নিউদগীরন ঘটেছে। সমাজের রক্ষনশীলদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এবং ইংরেজ শাসনের তীব্র শোষন ও অবহেলার ভিতর দিএ আন্দোলন মাথা তুলেছে যা সমগ্র ভারতবাসীকে দিশা দেখিয়েছে ল রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার পরে নীলচাষের বিরুদ্ধে জনগনের আনদোলন বিক্ষোভ। ১৮৫৩ সালে সনদ পরিবর্তনের জোরালো দাবী তুলল বাংলার মানুষ। এরপর ১৮৫৩ শিক্ষা বিষয়ক উড়ের ডেচপ্যাচ এবং পরের বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাঙালী মানসে শিক্ষার আগুন জ্বেলে দিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' স্তোত্র ভারতবাসীর কাছে অগ্নিমন্ত্র হয়ে উঠল। বিবেকানন্দের শৌর্যবীর্য দেশাত্মবোধ ও নিষ্কামকর্ম যুবসম্প্রদায়ের কাছে আদর্শ হয়ে দাঁড়াল। বাংলায় বিভিন্ন সংবাদ পত্রে ইংরেজ সরকারের ভারতবিরোধী কার্যকলাপ ও শোষন শাসনের কথা প্রকাশ পেতে থাকল। ভারতের জনগনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠল। দাদাভাই নবওরোজি, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ড. সীতারামাইয়ার আগমনে ভারতের রাজনীতির সংগ্রাম জোরালো হয়ে উঠল। সমাজ বাংলাদেশে শিক্ষিত বাঙালী তো বটে আম জনতার মধ্যে রাজনৌতিক চেতনার জন্ম নিয়েছে। তাই শিক্ষা - সংস্কৃতি - ধর্ম - দর্শন ও সমাজের সেই অভিঘাত সংস্কার এনেছে। যা বাঙালী জাতিকে প্রগতিশীল হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২.৪ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

কোম্পানীর শাসন শোষন ও ব্রিটিশ সরকারের উদাস্টনতা ভারতবর্ষের জনগনের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করল। জনগনের দাবী ও স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনৈতিক ভাবে আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়োজনে রাজনৌতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম নিল। ১৮৩৬ এ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, ১৮৩৮ সালে জমিদার সভা, সুদূর ইংল্যান্ডে রামমোহন সুহৃদ উইলিয়াম অ্যাডাম ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। এই সংস্থা ভারতবাসীর কল্যানের জন্য স্থাপিত হয়, ভারতের প্রকৃত অবস্থা ইংল্যান্ডবাসীকে জানানোর ব্যবস্থা ও করা হয়। ভারতবাসীর রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার প্রাপ্তির জন্য

কলকাতার যুব সমাজকে নিয়ে টনসনের উদ্যোকে প্রতিষ্ঠিত হল 'বেঙহগল - ব্রিটিশ - ইন্ডিয়া সোসাইটি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে'। বাংলার শিক্ষিত জনগন নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে রাজনৌতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থেকে 'জমিদার সভা' ও 'বেঙ্গল - ব্রিটিশ - ইন্ডিয়া সোসাইটি' একহয়ে ১৮৫১ সালে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের'র জন্ম লাভ। এটি একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের আর্শে বোম্বাইতে গড়ে ওঠে 'বোম্বাই নেটি অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫২)। ১৮৫২ সালে মাদ্রাজে গড়ে ওঠে 'মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের'। সিপাহী - বিদ্রোহের পরে ১৮৭৫ সালে জাতীয় জাগরনের জন্য 'ইন্ডিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মত প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত হল 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা' (১৮৭৬)।

রাজনৈতিক সভা সমিতি প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় জনগনকে উদ্দীপিত রেছিল। এমন সময় ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' আইন পাশ করলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই নওরোজি ও উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দি লন্ডন ইন্ডিয়ান সোসাইটি'। ১৮৮৪ সালে জনগনের স্বার্থ রক্ষার্থে সুব্রহ্মন্য আয়ার, আনন্দ চার্লুর নেতৃত্বে 'মাদ্রাজ মহাজন সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম এর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রস প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতিতে মাইল ফলক স্বরূপ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে -

'১৮৮৫ ক্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষ লগ্নে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে এক নবযুগের সূচনা হয়।"

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন (১৮৮৫) ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৬ সালে, তৃতীয় অধিবেশন ১৮৮৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসকে ধ্বংস করার চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক সদত বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র ও বিদ্বেষ মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করেছিল কিন্তু জনগনের সাবলীল অংশ গ্রহন ও নেতৃত্বের জন্য তা সম্ভব হয় নি। কংগ্রেস পরবর্তী কালে কংগ্রেস সংবিধান সংস্কার, অর্থনৈতিক সংস্কার, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার কথা উত্থাপন করল।

ভারত মূলত কৃষিপ্রধান দেশ ১৮৩৩ সাল থেকে নীল, রবার, চা, কফি চাষ শুরু করেন ইংরেজরা। ১৮৫৪ সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ন লর্দ ডালঔসির উদ্যোগে রেলপথে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

যোগাযোগ ব্যবস্থা শুরু হল। এর পর থেকে ভারতে ব্রিটিশ বিনিয়োগ জোর কদমে ঘটল। শিল্পপতিরা ভারতে উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াতে থাকল। নীল, চা ও বস্ত্র শিল্পের ব্যাপক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র ইংরেজ পুঁজিপতি নয় ভারতীয় পুঁজিপতিদের যৌথ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। সুতিবস্ত্রের ক্ষেত্রে ১৯২১ সালে ৩৩৫ টি মিল এরে মধ্যে ৯টি ছিল ইউরোপীয় মালিকাধীন এবং বাদবাকী দেশীয় মালিকাধীন। নীল চাষের ক্ষেত্রে ইউরোপে নীলের চাহিদা বেড়ে গেলে এদেশে নীলকুঠী গড়ে ওঠে ইংরেজরা জোরকরে চাষ করতে বাধ্য করত, এর ফলে নীল বিদ্রোহের সংঘটিত হয়। চা ও কফির ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রচুর সংস্থার জন্ম হয় । ১৮৫৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী জর্জ অকল্যান্ড রিষড়ায় প্রথম পাটের কল স্থাপন করেন এবং এই পথ ধরেই পাটকল বাড়তে থাকে ও প্রচুর কর্মচারী নিযুক্ত হয়। ১৮৭৪ বিলাতে উদ্যোগে বেঙ্গল আয়রন ওয়াকর্স কোম্পানি’, । ইন্ডিয়ান আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানি স্থাপন হয়। কাগজ, চামড়া, ইঞ্জিনিয়ারিং, পশম, মদ, সিমেন্ট, কাঁচ শিল্পের ও প্রসার দেখা যায়। কয়লাখনির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মালিকানা ও লক্ষ্য করা যায়, যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুরের, ‘কার টেগোর এন্ড কোম্পানি’ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় শিবপুরে লৌহকারখানা স্থাপন করেন । ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মার্টিন ও রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ প্রচেষ্টায় মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি’ প্রতিষ্ঠান লাভ করে ল এভাবে কৃষি ভিত্তিক ভারতভূমিতে শিল্প বানিজ্যের প্রসার ঘটল।

সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্কুল কলেজ স্থাপিত হল। বিভিন্ন অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ জেহাদ ঘোষনা করলেন। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে এদেশে এক নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্ম নিল যারা ঘুনধরা ভারতবর্ষের বুকে পাশচাত্য যুক্তি ও চিন্তাচেতনার আলোকে সমাজ পরিবর্তনের অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলন। ১২ বছরের নীচে বালিকার বিবাহ বন্ধ । আইনের মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেল। ভারতীয় সমাজ - রাজণিতি সভ্যতার বুকে এই অভিঘাতে মূল হল - “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে যে নব-ভারত গড়ে ওঠে তার মূলে ছিল পাশ্চত্য শিক্ষা।”

২.৫ আধুনিক যুগের বিকাশ কালে বাংলা সাহিত্যের গতিধারা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আধুনিকতার যে জোয়ার এসে লেগেছে বাঙালীর

হৃদয়ে তার ধারা দ্বিতীয়ার্ধে অব্যাহত। শিক্ষা ধর্ম দর্শনে শুধু নয় সাহিত্যেও জন্ম নিল নিত্য নতুন চিন্তা ভাবনা। বাঙালীমন শুধু বাংলা সাহিত্য পয়ার ও অফিস আদালতের গদ্যে বাঁধা পড়ে রইল না, বিদ্যাসাগরের হাতে প্রাঞ্জল বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্ম নিল যা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী লেখক কুলের জন্ম নিশ্চিত করল। উপন্যাস গল্প, নাটক, কাব্য-কবিতা, সাহিত্যিক মহাকাব্য ব্যঙ্গ কবিতা, প্রহসন প্রভৃতি সাহিত্যের নানা প্রকরণ তৈরি হল। আধুনিক কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গতিপথ ও ক্রমপরিবর্তিত হতে থাকল সৃষ্টি হল সাহিত্যের নব নব প্রকরণ।

টিপ্পনী

২.৬. গদ্য ও প্রবন্ধচর্চার বিস্তৃতি

ফোর্ট উইলিয়াম শ্রীরামপুর মিশন, রামমোহন রায় যে গদ্য চর্চা শুরু করেছিলেন তা উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিস্তৃতি লাভ করল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত নির্ধারিত পথ অতিক্রম করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধচর্চার ক্ষেত্রে নব দিগন্তের স্থান দিলেন।প্রবন্ধ সাহিত্যে, জ্ঞান বিজ্ঞান, হাসি, ব্যাক্তিগত, বস্তুগত, ধর্ম, শিল্প, ইতিহাস, সকল বিষয়কে যুক্তিপূর্নভাবে প্রকৃষ্ট বন্ধনে বাঁধলেন। প্রবন্ধ চর্চার ব্যাপক বিস্তৃতি এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরিলক্ষিত হয়।

(ক) প্রাতঃস্মরনীয় গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর:

বাংলা গদ্যের বিকাশ ও প্রতিষঠা পাঠে ফোর্ট উইলিয়াম শ্রীরামপুর কলেজ গোষ্ঠী থেকে শুরু করে আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪ খ্রীঃ - ১৮৩৩ খ্রীঃ) ও বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা গদ্যকে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলবার যাবতীয় শক্তি তারাই সঞ্চারিত করে দিয়ে ছিল। বাংলা সাহিত্যে নয় সমাজ সংস্কৃতিতে ও সংস্কারের মানবিক বোধে বিদ্যাসাগরের জুড়ি মেলা ভার। আধুনিক যুগের এই উল্লেখকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা সংস্কারের আনলেন এক নব জাগরন।

আজীবন সৃষ্টিশীল কর্মবীর বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থসম্ভার নিম্নে প্রদত্ত হল:

- বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৭৪)
- বাঙলার ইতিহাস, ২য় ভাগ (১৮৪৮)

টিপ্পনী

- জীবনচরিত (১৮৪৯)
- বোধোদয় (১৮৫১)
- শকুন্তলা (১৮৫৪)
- বর্ণপরিচয় দুইভাগ (১৮৫৫)
- কথামালা (১৮৫৬)
- চরিতাবলী (১৮৫৬)
- সীতার বনবাস (১৮৬০)
- আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩)
- ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯)
- সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩)
- ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম - ৪র্থ ভাগ ১৮৫৩ - ৬২)
- বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (২য় ভাগ - ১৮৫৫)
- বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১ - ৭৩)
- অতি অল্প হইল (১৮৭৩)
- আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩)
- ব্রজবিলাস (১৮৮৪)
- রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)
- আত্ম চরিত (১৮৯১)
- প্রভাবতী সম্ভাষন (১৮৯১)

(খ) অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০ - ৮৬)

বাংলায় গ্যের রাজপথ নির্মানে বিদ্যাসাগর প্রধান সহযোগী ছিলেন তাঁরই সমবয়সী অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০ - ৮৬)। পাশ্চাত্য প্রথার বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে বাঙ্গলা ভাষায় জ্ঞান - বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার সার্থক ভাবে করেন সর্বপ্রথম অক্ষয় কুমার। (সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস) এ মন্তব্য সর্ব্বৈ সত্য যা তার রচিত গ্রন্থ

থেকে বোঝা যায়।

রচনা সম্ভার -

টিপ্পনী

- ভূগোল - (১৮৪১)
- পদার্থবিদ্যা - (১৮৫৬)
- চারুপাঠ - (তিনখন্ড, ১৮৫৩ - ৫৯)
- বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকতির সম্বন্ধ বিচার - (প্রথম ও দ্বিতীবভাগ ১৮৫১, ১৮৫৩)
- ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় - (প্রথমভাগ - ১৮৭০, দ্বিতীয়ভাগ ১৮৮৩)
- ধর্মনীতি - (১৮৫৬)

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অক্ষয়কুমার ছিলেন কৌতুহলী মানুষ। জ্ঞান - বিজ্ঞান ভাষা, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব সকল বিষয়ে তার ছিল অবাধ যাতাযাত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় তার বিখ্যাত গ্রন্থ, জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্যের এক অপূর্ব সমন্বয় এই গ্রন্থে আছে। আছে তুলনামূলক আলোচনা ও অক্ষয়কুমারের লেখায় যুক্তি, বিশুদ্ধ জ্ঞান, সমকালীন মানসিকতার প্রতিফলন। তাঁর ধর্মনীতি, ভারতবার্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় এর মধ্যে কোঁৎ, স্পেন্সার, বেন্থাস - মিল প্রতিফলন ঘটেছে। 'ধর্মনীতি উৎস জর্জকুম্বের 'Moral Philosophy'

অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর পরিচালিত পত্রিকায় তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা গুলি প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ১২ বছর ধরে এই পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর জীবনের গদ্য রচনার প্রেরনা স্বরূপ ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়।

(গ) কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০ - ৭০)

হাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ । রামমোহন বিদ্যাসাগরের পথ অনুসরনে বাংলা গদ্য সাহিত্যে আর্বিভাব। তিনি এক প্রগতিশীল মানুষ। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ঐতিহাসিক 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ'। তাঁর গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব 'হুতোম প্যাঁচার নক্স' । তৎকালীন সমাজের এক চিত্রশালা এই গ্রন্থে চড়ক পার্বনের কথা, ছেলেধরা, হুজুগ - ব্যাঙ্গ, মাহেশের স্নান যাত্রা, রাসলীলা, সমাজের ব্যাভিচার প্রভতির

বাস্তব চিত্রন করেছেন কালীপ্রসন্ন।

টিপ্পনী

এই নক্সায় ব্যাঙ্গের মধ্যদিয়ে কলকাতায় গজিয়ে ওঠা হঠাৎ বাবু গোষ্ঠী ও তাদের উদ্দামতা, ফেনিল পঙ্কিল জীবন তিনি সাহিত্যে কঙ্কিত করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সাহিত্যের এক ঐতিহাসিক দলিল হুতোম। এর ভাষা ও বিষয় ছিল সাধারনের বোধগম্য। চলিতভাষার এমন প্রকাশ এই প্রথম ঘটল যা বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার গতিপথকে অবারিত করল। প্রতিটি বিষয় সময়ের প্রতিচ্ছবি। যেমন 'রেলওয়েতে তৃতীয় শ্রেনীর যাত্রীদের করুন চিত্র, মিউটিনীতে নীলকরদেদর অত্যাার ও পাপ কর্মের কথা এবং বাঙালী ভিরুতার দিকটি ও প্রকাশিত। রাসলীলা, চড়ক পার্বনে, মাহেশের স্নানযাত্রায় কালীপ্রসন্ন যে চিত্র তুলে ধরলেন তা সমাজ ইতিহাস সমৃদ্ধ।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা বহু প্রতিভাবান সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক গনের পরিচয় পাচ্ছি। যাদের অনেকেই বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ক্ষমতাকে সচল রেখে ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সকল রূপগুলি ধরে আলোচনা প্রয়োজন। বাংলা প্রবন্ধ গদ্য সাহিত্যের অগ্রগতিতে রামমোহন - বিদ্যাসাগরের পথ অনুসরন করে হৃদয়গম্য প্রবন্ধ নিয়ে উপস্থিত হলেন -

(ঘ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের সূত্র ধরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্থান। তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাকে দিল সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা।

গ্রন্থ পরিচিতি

- কঠোপনিষদের বাংলা অনুবাদ - (১৮৪০)
- বাংলা গদ্যে প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ - (১৮৪৫)
- ব্রাহ্মণ ধর্মগ্রন্থ - (১৮৫০)
- আত্মতত্ত্ববিদ্যা - (১৮৫২)
- প্রাচীন বয়সের লেখা - (১৮৯৪)
- জীবনচরিত - (১৮৯৮)

- পত্রাবলী - (১৮৫০ - ১৮৭০)

তাঁর অধিকাংশ রচনাই বক্তৃতা এবং ধারাবাহিক ভাবে তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা গ্রন্থ হিসাবে আত্মপ্রকাশ পেয়েছে। জীবনস্মৃতিতে ১৮ বছর বয়স থেকে ৪১ বছর পর্যন্ত সময়কালের বিবরণ এখানে আছে। দবেন্দ্রনাথের প্রতিটি লেখা গভীর ধর্মীয় নিষ্ঠা, হৃদয়ধর্মী চিন্তা চেতনার প্রতিফলন যা মৌলিক ও সাহিত্যগুন সম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

টিপ্পনী

(ঙ) প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৩ - ৮৩)

টেঁকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় সাহিত্যিক প্যারীচাঁদ মিত্র।

গ্রন্থসমূহ:

- আলালের ঘরের দুলাল - ১৮৫৮
- মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায় - ১৮৫৯
- রামারঞ্চিকা - ১৮৬১
- কৃষিপাঠ - ১৮৬১
- যৎকিঞ্চিৎ - ১৮৬৫
- অভেদি - ১৮৭১
- আধ্যাত্মিকা - ১৮৮০
- এছাড়া ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত, গীতাঙ্কুর রচনা করেন।

ডিরেজিও ছাত্র হয়েও প্যারীচাঁদ মিত্র ব্রাহ্ম ভাবভধারায় পুষ্ট। আলালের ঘরের দুলল - উপন্যাস লক্ষনাক্রান্ত গদ্য আখ্যান রচনার প্রথম কৃতিত্ব প্যারীচাঁদ মিত্রের। এই আখ্যানে কলকাতার ধনী পরিবারের আদরের দুলালের অধঃপতন আঁকা হল। মতিলাল ঠকচাচা সহ ব্রজনাথ, মৌলভি, ঘুষখোর পেশকার, শিক্ষক বক্রেশ্বর চরিত্র গুলি বাংলা সাহিত্যে সম্পদ । নীতি শিক্ষা মূলক রচনাগুলি - 'রামারঞ্চিকা', 'অভেদী' ও 'আধ্যাত্মিকা'। এই গ্রন্থগুলিতে সাহিত্য গুন তেমন লক্ষিত হয় না।

টিপ্পনী

(চ) বঙ্কিমকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)

সৃজনশীলতার এক অনন্য প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে তার জ্ঞান গর্ভ ও যুক্তিনিষ্ঠা আলোচনা তাকে অমরতা দান করেছে। দেশ বিদেশের সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি নীতিবাদীদের আলোচনা তার গদ্য রচনার ক্ষেত্রে উঠে এসেছে, শেষ পর্যন্ত তা নিজস্ব যুক্তি নীতি মননে তা ঋদ্ধ। ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে জানালেন-

"গত শতকের শেষপাদ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের দওনাচার্য। তাঁর সারস্বত সাধায় কারয়িত্রী প্রতিভা ও 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা' দুইয়ের সমান প্রভাব দৃশ্যমান।"

বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি হল:

ইতিহাস ও দর্শনধর্মী প্রবন্ধ সমূহ

বিবিধ সমালোচনা - ১৮৭৬

সাম্য - ১৮৭৯

প্রবন্ধ পুস্তক - ১৮৭৯

কৃতচরিত্র - ১৮৮৬

বিবিধ প্রবন্ধ - ১৮৮ - ৯২

ধর্মতত্ত্ব - ১৮৮৮

বিজ্ঞান ধর্মী প্রবন্ধ সমূহ:

বিজ্ঞান রহস্য - ১৮৭৫

সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থ

বিবিধ প্রবন্ধ

ব্যাক্তিধর্মী প্রবন্ধ গ্রন্থ

কমলাকান্তের তিনটি অংশ -

(ক) কমলাকান্তের দপ্তর - ১৮৭৫

(খ) কমলাকান্তের পত্র

(গ) কমলাকান্তের জোনবানবন্দী

(ছ) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪)

শিক্ষা - সমাজ - বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক চিন্তা ভাবনা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গদ্যে স্থান পেয়েছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশে তার অবদান আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তাঁর রচনা গুলি হল -

- শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব - ১৮৫৬
- প্রাকৃতিক বিজ্ঞানন (প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ) - ১৮৫৮ - ৫৯
- পুরাবৃত্ত সার - ১৮৫৮
- ইংলন্ডের ইতিহাস - ১৮৬২
- ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং রোমের ইতিহাস - ১৮৬৩
- বাঙ্গলার ইতিহাস (বিশশতকে প্রথম দশকে প্রকাশিত) - ১৯০৪
- পারিবারিক প্রবন্ধ - ১৮৮২
- সামাজিক প্রবন্ধ - ১৮৯২
- আচার প্রন্ধ - ১৮৯৪

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কালসচেতক, তথ্যযুক্ত দার্শনিকতাও যুক্তিবাদী। আচার ও পারিবারিক প্রবন্ধে বাঙালী গৃহস্থের পালনীয় জীবনচর্যা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেছেন। 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে প্রাচীন রাজাদের রাজকার্য পরিচালনা থেকে ইংরেজ বণিকদের আলোচনা বিচার বিশ্লেষন করেছেন।তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বিদ্যালয়ের জন্য পুরাতত্ত্ব । প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন।

আত্মমূল্যায়ন ধর্মী প্রশ্ন

১। বাংলার সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা কর।

২। গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের অবদান বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা লেখ।

৩। অক্ষয় কুমার দত্তের রচনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। গদ্য শিল্পী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

২.৭. বাংলা উপন্যাস ও গল্প সাহিত্যের ঐতিহাসিক পর্যায়

একটা জোয়ার যখন আসে নদীর দুকুল প্লাবিত হয়। পাশ্চাত্য চেতনা প্রসূত নবজাগরনের ঢেউ বাংলার চেতনা ভূমিকে তেমনি সিক্ত করল। এমন এক অভিঘাতে মানবজীবন তথা শিল্প, শিক্ষা, রাজনীতি সমাজ সাহিত্যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হল। বাংলায় শিক্ষা সাহিত্য - সমাজে নব নব ব্যাক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটল। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় পরিমন্ডল শাসিত সময় হল অবসিত। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে মানবের কথাই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। গদ্য সাহিত্যের আগমন ও আধুনিক কবিতার সূত্রপাত ঘটল । কথা সাহিত্যের জন্ম হল একটু পরে। এমন আধুনিক প্রকরন জন্ম নেওয়ার পেছনে পাশ্চাত্য প্রভাব আধুনিক নরনারীর মনস্তত্ত্ব এবং আধুনিক শিল্প সভ্যতার ব্যাপক প্রভাব। পুরানো সমাজব্যবস্থা মানসিকতার ক্ষয়িষ্ণুতা এবং আধুনিক মানস জাগরন এমন এক প্রবল দ্বন্দ্ব অভিঘাতে জন্ম নিল উপন্যাস।

আদুনিক কালের সফল উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত সুচনা উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সাহিত সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিই 'দূর্গেশনন্দিনী' থেকেই সার্থক যাত্রা শুরু। উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বে প্রাক সৃষ্টি পর্ব ছিল যা উপন্যাসকে হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূর্বনকশা, আখ্যান-উপাখ্যান - রোমান্স উপন্যাস কল্প গুলি আলোচনা আব্যাশিক

ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায়ের কলিকাতা কমলালয় - ১৮২৩, নববাউ ইলাস - ১৮২৫, নববিবি বিলাস - ১৮৩১, এগুলি সামাজিক নকশভভ জাতীয় রচনা। রামমোহন যুগের প্রাচীন পন্থী ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম রচনা 'নববাবু বিলাস' ব্যঙ্গ বিদ্রুপে ভরা। মদ ও নারীতে আসক্ত, অশিক্ষিত উদিগ্ন বাবু সম্প্রদায়ের ব্যঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন, তাদের উৎসশৃঙ্খতা, রুচিহীনতা ও শিক্ষা দীক্ষার দিক প্রাধান্য পেয়েচে। নববাবু বিলাসে নববিবিদের ও বিদ্রুপবানে বিদ্ধ করা হয়েছে। ভবানীচরনের লকেখায় কলকাতা কেন্দ্রিক বিষয় আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬১) ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ ? টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৪) ব্যাঙ্গ বিদ্রুপপ জাতীয় সামাজিক নকশা।

কিছু প্রাচীন কথার অনুবাদ আখ্যানধর্মী হয়ে উঠেছে আবার কিছু গদ্য লেখা আখ্যান বা উপন্যাস কল্প হয়ে উঠেছে এমন গ্রন্থ গুলি হল -

রমালাল মিত্রের 'শকুন্তলার উপাখ্যান' - ১৮৫৪, বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' - ১৮৫৪, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'দশকুমার' -১৮৫৬, রামনারায়ন তর্করত্ন 'পতিব্রতোপাখ্যান' - ১৮৮২, নীলমনি বসাকের 'নরনারী' - ১৮৫২, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের -'অঙ্গুরীয় বিনিময়' - ১৮৬২ ও 'সফল স্বপ্ন' -১৮৫২। হ্যানা ক্যাথরিন মুলেন্সের - 'ফুলমনি ও করুনার বিবরন' - ১৮৫২। এই বিদেশিনী এদেশে এসে বাংলা শিখে বাংলা উপন্যাস ধর্মী আখ্যান লিখলেন। মুলেন্স এর আখ্যানটি 'The Last Day of the week' এর ছায়ানুসরন। এই সময় 'উপন্যাস' নামধারী কিছু আখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায় . নীলমনি বসাক ও গিরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'পারস্য উপন্যাস' -১৮৩৪, হরিমোহন সেন সম্পাদিত 'আরব্য উপন্যাস' ১৮৩৯। এছাড়া শেক্সপীয়ারের নাটকের কিছু গল্প অণুবাদ এবং অনুদিত ভ্রমন কাহিনী। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাঙ্খের কথা ভ্রমন' ১৮৫৭, 'বিচিত্রবীর্য '- ১৮৬২, 'পৌলবর্জিনী' - ১৮৬২, উপেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অপূর্ব দেশ ভ্রমন' - ১৮৭৬ [গালিভারস্ ট্রাভেলসের অনুবাদ বিপিন বিহারী চক্রবর্তি - অদ্ভুত দিগ্বিজয় -১৮৮৩ [ডন কুইকমোটের অনুবাদ]

ভবানীচরন ও প্যারিচাঁদ মিত্রকে নকশা উপনাসের পথ সূচিত করল। 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যসের অনেক বৈশিষ্ট্য ভূষিত হলেও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বলা চলে না একে উৎকৃষ্ট নক্‌শা জাতীয় রচনার পর্যায়ভূক্ত বলা হয়েছে। তবে উপন্যাসের আভাস পুরোমাত্রায় লক্ষিত হয়।

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম স্তোত রচনার মধ্যদিয়ে দেশ মাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনগনের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগাতে চাইলেন। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তিনি কলম ধরেছিলেন। যার হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল 'বঙ্গদর্শন'। পাশ্চাত্য Novel এর ফর্ম সামনেথাকলে ও তা আতস্থ করে নিজস্ব জীবন বোধ ও প্রতিভা বলে গড়ে তুললেন সার্থক উপন্যাস।

- **উপন্যাস সমূহ**

ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী

দুর্গেশনন্দিনী - ১৮৬৫

কপালকুন্ডলা - ১৮৬৬

মৃনালিনী - ১৮৬৯

যুগলাঙ্গুরীয় - ১৮৭৪

চন্দ্রমোঘর - ১৮৭৫

রাজসিংহ - ১৮৮২

সীতারাম - ১৮৮৭

- **পারিবারিক ও সামাজিক**

বিষবৃক্ষ - ১৮৭৩

রজনী - ১৮৭৭

কৃষ্ণকান্তের উইল - ১৮৭৮

- **দেশাত্মক ও তত্ত্বমূলক**

আনন্দমঠ - ১৮৮৪

দেবী চৌধুরানী - ১৮৮৫

- ইংরেজি রচনা

Rajmohan's Wife - 1864

প্রানোচ্ছল সাবলীল ইংরেজি ভাষায় প্রথম রচিত উপন্যাস Rajohans Wife । অসমাপ্ত এই অনুবাদের বিষয় আধুনিক বাঙালী পরিবারের জীবন ও ঘরের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র আর ইংরেজিতে উপন্যাস রচনা করলেন না। তিনি বাংলা ভাষাতেই সার্থক উপন্যাস রচনা করতে পারবেন তা মনস্থির করেছিলেন। 'Rajmohan's Wife' এর অনুবাদ করেছিলেন সজনীকান্ত দাস বঙ্কিমচন্দ্র জন্মশতবর্ষে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সার্থকতা এসেছে ইতিহাস ও রোমান্সকে আশ্রয়করে রচিত উপন্যাসে। মোঘল বিজয়ের কাহিনী 'দুর্গেশনন্দিনী' ষোড়শ শতকের অন্তিমে বাংলায় মোঘল পাঠান দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এর কেন্দ্রিয় বিষয়। ঐতিহাসিক ঘটনা চরিত্র অবলম্বন করে বীরত্ব প্রণয় আত্মত্যাগের কাহিনী গড়ে তুললেন।বীরেন্দ্র সিংহ, কতুল খাঁ, অভিরাম স্বামী, তিলোততমা জগৎ সিং আয়েষা, বিমলা চরিত্র গুলিকে উপন্যাসে যথাস্থানে করলেন প্রান প্রতিষ্ঠা। নরনারীর হৃদয় জগৎকে তিনি আধুনিক দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষন করলেন। 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসে রোমান্সের বাতাবরন তৈরি করে নারী কপালকুন্ডলাকে সমাজবন্ধনে বাঁধার চেষ্টা দেখা যায়। কপালকুন্ডলা - নবকুমার প্রসঙহগ ছাড়া মতিবিবির প্রসঙ্গটি হৃদয় ধর্মের চিরন্তন দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে যা মনশুত্ত্ব সম্মত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস রোমান্স মূলক গুরুত্বপূর্ন উপন্যাস 'মৃণালিনী' মানবজীবনের দ্বন্দ্বসংঘাত রহস্যময় দিককে তিনি স্থান দিলেন। বখতিয়ার খিলজীর সপ্তদশ অশ্বারোহী যোগে বাংলার নদীয়া জয়ের ঘটনা স্থান পেল উপন্যাসে। পশুপতি হেমন্দ্র মৃনালিনীর চরিত্র গুলি সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্য কীর্তি।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে একদিকে ইতিহাস আর একদিকে গার্হস্থ্যজীবনের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

কথা প্রতাপ শৈবালিনী চন্দ্রশেখরর মধ্যদিয়ে এঁকেছেন, মীরকাশিম দলনীবেগম আমিয়ট প্রভৃতি ইতিহাস থেকে চরন করা। প্রতাপ শৈবলিনীর বাল্যপ্রেম কে অবৈধ প্রেমের কাহিনী হিসাবে দেখানো হয়েছে, এই অবৈধ প্রেম কে উপন্যাসে আনলেও তার পরিনতি পরিনয়ে হয় নি। শৈবালিনীর প্রায়শ্চিত্তের মধ্যদিয়ে বাল্যপ্রণয় ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'। রাজসিংহ, হেবউন্মাসা, ঔরঙ্গজেব চরিত্রগুলি ইতিহাসের বিশ্বস্ত অনুসরন রাজসিংহের প্রতাপ ও শৌর্যবীর্য বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের সামনে মেলোএ ধরলেন। রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে তার প্রণয় যা রক্তমাংসের মানব মানবীর মত করে গড়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রতিটি ঐতিহাসিক রোমান্স মূলক উপন্যাসে ইতিহাস মানবজীবনকে শিক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মিশ্রন ঘটিএছেন। এমন বিষয় পাঠকের কাচে নতুনত্বের দিশারী যা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমপূর্বযুগে পরিবেশিত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি দেশাত্মবোধমূলক ও তত্ত্বধর্মী উপন্যাস হল 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী'। আনন্দমঠ দেশপ্রেমের বন্ধনার মুখর 'বন্দেমাতরম' সংগঠনের মধ্যদিয়ে যার প্রকাশ সমালোচকগন অনেক হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপন্যাস বলে মনে করেন। 'দেবী চৌধুরানীতে' গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শবাদ মূর্ত। 'সীতারাম' উপন্যাসে ও হিন্দু রাজ্য বিস্তারের কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসটি 'বিষবৃক্ষ' ও কৃ°নকান্তের উইল', 'বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'বিষবৃক্ষ'। নগেন্দ্র - সুর্যমুখী - কুন্দনন্দিনী মত অসাধারন চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দান করলেন বঙ্কিমচন্দ্র রূপমোহজাত নাগেন্দ্র চরিত্রের উত্থান পতন। পত্নী হিসাবে আদর্শ সূর্যমুখী। অসহায় বিধবা কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে প্রেমের জন্ম বা বাংলা সাহিত্যে অবৈধ প্রেমের। সমাজ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃত পেল। এ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নর-নারীর মধ্যে মনস্তত্ত্বের দ্বান্দিক রূপকে প্রকট করে তুললেন। যে আধুনিক মনস্ক পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করল। কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে ও বিধবা নারীর উপস্থিতি তে গোবিন্দ লালের সংসার টালমাটালল করে দিয়েছে। অবৈধ৭ প্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে প্রাধান্য পায়নি তাই তিনি মেনে না নিয়ে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে বিষয়ে পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। দুটি উপন্যাসে নায়ক চরিত্রের সংযমের অভাব লক্ষিত হয়। রূপজ মোহই সংসারে বিপত্তির মূল হিসাবে দেকানো হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুদ্র দুটি উপন্যাস 'রাধারানী' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' কে "আকারে, ঘটনা-গ্রন্থনে, চরিত্র- চিত্রনে সবদিক থেকেই এই রচনা গুলির মধ্যে ছোটগল্পের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যাব।' (ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়)

টিপ্পনী

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক অপ্রধান ঔপন্যাসিক

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৫-৯১)

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'স্বর্নলতা'। ৪৫টি পরিচ্ছদের একটি উপন্যাসই তাকে অমরত্ব দানকরেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ এর সময়েই এই জনপ্রিয় উপন্যাস রচিত। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় খুবই সাধারন মানব মানবীর জীবন কথাকে আশ্রয় করে বাঙালী ঘরের কথা উপন্যাসে পরিবেশন করলেন। ১৯০৩ সালে বিধুভূষন মুখোপাধ্যায় 'A Glimpes into the Indian Inner Home' নামে স্বর্নলতার ইংরেজি অনুবাদ করেন। পরে এডওয়ার্ড টমসন 'The Brothers' নামে অনুবাদ করেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'স্বর্নললতা' ভিন্ন অন্যান্য রচনা গুলি হল-

- ললিতগ সৌদামিনী - ১৮৮২
- হরিষে বিষাদ - ১৮৮৭
- অদৃষ্ট - ১৮৯২
- বিধিলিপি - ১৮৯২

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

তিনি দুটি সামাজিক উপন্যাস লিখলে ও ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। রচনাগুলি নিম্নরূপ-

- মাধবীকঙ্কন - ১৮৭৭
- বঙ্গবিজেতা - ১৮৭৪
- মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত - ১৮৭৮
- রাজপুত জীবন সন্ধ্যা - ১৮৭৯

টিপ্পনী

- সংসার-১৮৮৬
- সমাজ-১৮৯৪

ইতিহাস ও রোমান্স রস নিয়ে গড়ে ওঠে 'মাধবীকঙ্কন' জমিদারপুত্র নরেন্দ্র তার ভাগ্যবিপর্যয় এবং হৃদয়ে প্রেমের অনুরাগ আজন্ম লালন করে বেড়ানোর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'বঙ্গবিজেতা'য় টোড়রমলের বিরুদ্ধে অমরসিংহের বিদ্রোহ ও সংঘর্ষ এখানে মূল বিষয় হয়ে উঠেচে। চরিত্র ও ঘটনাবাহুল্য উপন্যাসটির সমুন্নতি দানে বাধা দান করেছে। পরবর্তী 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' উপ্যাসে মোঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠা শক্তির স্বাধীনতা ও সংগ্রামের কাহিনীই প্রধান। মূল চরিত্র বীর শিবাজী মূলত শিবাজীর নেতরত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থানের কাহিনী মুখ্যহয়ে উঠেছে। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাসে রাজপুত পরাজয়ের কাহিনী বর্ণিত। অসবর্ন বিবাহের পক্ষে এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে মতামত আছে-'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাসে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯)

- কণ্ঠমালা-১৮৭৭
- মাধবীলতা-১৮৭৪
- রামেশ্বরের অদষ্ট
- জাল প্রতাপচাঁদ

'কণ্ঠমালা' শিথিল গোছের রচনা, 'মাধবীলত' উপন্যাস খাপছাড়া বনর্ণা ও বাংলা রূপকথাকে মনে করায়। বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাস 'জালপ্রতাপ চাঁদ'। উপন্যাস ছাড়া ও তিনি 'পালামৌ'এর মত ভ্রমনকাহিনী রচনা করে তৎকালে পাঠকমনে জয় করেছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৭৪-১৯১১)

- সেজবৌ-১৮৮০
- যুগান্তর-১৮৯৫
- নয়নতারা-১৮৯৯

- বিধবার ছেলে - ১৯৯৫

'সেজবৌ' ও যুগান্তর গার্হস্থ্য ও সামাজিক উপন্যাস।

টিপ্পনী

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭)

- মৃন্ময়ী - ১৮৭৪
- নবাবনন্দিনী - ১৮৯৭

'মৃণ্ময়ী' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলার' উপসংহার হিসাবে রচিত। তিনি 'মৃণ্ময়ী' তে মিলনাত্মক ঘটনার মধ্যদিয়ে উপসংহার টেনেছেন। 'নবাবনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের 'দূর্গেশন্দিনী' উপন্যাসের প্রেমিকা নারী আয়েষার সুখ-দুখের আশা আঙ্খার কাহিনী।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

- কাঞ্চনমালা - ১৮৮৩
- বেনের মেয়ে - ১৯১৯

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

- বঙ্গাধিপ পরাজয় (১৮৬৯, ১৮৮৪, দুটি খন্ড)

বাংলা সাহিত্যের সবথেকে বৃথত উপন্যাস প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গধিপ পরাজয়'। এটি ঐতিহাসিক বিষয় নির্ভর উপন্যাস এতে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পতন ও পারিবারিক ষড়যন্ত্রকে দেখানো হয়েছে।

স্বর্নকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)

বঙ্গমহিলা সাহিত্যিকদের অগ্রগন্য স্বর্নকুমারীদেবী। প্রথম থেকেই সাহিত্যের প্রতিতাঁর অনুরাগ পরিলক্ষিত। শুধু সাইত্য রচনা নয় 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যদিয়ে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজনীতিতে ও তিনি সমানতালে পা

টিপ্পনী

ফেলে এগিয়েছিলেন। তা রচনা গুলি হল:-

- দীপনির্বাস-১৮৭৬
- মালতী-১৮৮০
- হুগলীর ইমামবাড়া-১৯৮৮
- ছিন্নমুকুল-১৮৭৯
- স্নেহলতা-১৮৯০-৯৩
- কাহাকে-১৮৯৮
- মিবাররাজ-১৮৮৭
- বিদ্রোহ-১৮৯০
- ফুলের মালা-১৮৯৫

ঐতিহাসিক ও সামাজিক দুধরনের উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন, তাঁর স্নেহলতা' ও 'কাহাকে' সামাজিক উপন্যাস। কৌলিন্য প্রথার প্রতি উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে 'স্নেহলতায়', 'কাহাকে' উপন্যাসে আধুনিকা নারীর মনস্তাত্তিক বিশ্লেষন ধরা পড়েছে। ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস - 'দীপনির্বানে' পৃথ্বিরাজ এবং মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে দেশপ্রেমের পরকাঠা প্রকাশ পেয়েছে। এবং বিদ্রোহ -নাগাদিত্য এবং ভিল বিদ্রোহের কথা আছে। 'হুগলির ইমাম বাড়াটি মহসীন এবং তার ভগিনী মুন্নার কথা চিত্রিত।

যোগেশচন্দ্র বসু(১৮৫৪-১৯০৭)

- মড়েল ভগিনী-১৮৮৬-১৮৮৮
- চিনিবাস চরিতামৃত-১৮৮৬
- কালাচাঁদ-১৮৮০-৯০
- শ্রীশ্রীরাজলক্ষী-১৯০২

ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯১৭)

- কঙ্কাবতী-১৮৯২
- ফোকলা দিগম্বর-১৯০১
- মুক্তামালা-১৯০১

ত্রৈলক্যনাথ কৌতুক, রোমান্স ও উদ্ভট বিষয়কে অবলম্বন করে সাহিত্যরস পরিবেশন করলেন।

মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

- রত্নাবতী-১৮৬৯
- বিষাদসিন্ধু-১৮৮৫-৯১
- গাজী মিঞার বস্তানী-১৮৯৯

মিরমোশারফ হোসেন আধুনিক মুসলিম লেখকদের মধ্যে প্রতিভাশালী উনিশশতকের দ্বিতিয়ার্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। পারস্য ও আরবদেশের কাহিনী অবলম্বনে এই শোক মহাকাব্যেক্ষম উপন্যাস রচিত। হোসেন ও এজিদের যুদ্ধ শোকাবহ পরিনতি বিষাদগ্রস্থ করে তুলেছে 'বিষাদসিন্ধু'। উপন্যাসে আছে অসংখ্য চরিত্রের সমাহার যেমন - হাসন - হোসেন - এজিদ, মারওয়া, গাজীরহমান, হানিফা, হাসেনবাবু, জয়নাব, কাসেম, আসগর প্রমুখ 'গাজী মিঞার বস্তানী' কৌতুকর কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং রত্নাবতী রূপকথাধর্মি দুর্বলরচনা।

(গ) বাংলা গল্পের উদ্ভব ও বিস্তৃতি

সাহিত্যের রূপকথার দিকে লক্ষ্যরাখলে দেখা যাবে ছোটগল্প সম্পূর্ন আধুনিক কালে আধুনিক মনের সৃষ্টি। ছোটগল্প আধুনিক জীবনের ভাঙা-গড়া, চরিত্র মনস্তত্ত্ব ও একমুখীনতা নিয়ে গড়ে ওঠা শেষ সাহিত্যক প্রকরণ। এমন ক্ষুদ্রায়তন কাহিনী নির্ভর রচনা রবীন্দ্রনাথ, সাভগার আলেজ পো, মপাসাঁর পূর্বে যে তার প্রচেষ্টা করেনি তা বলা যাব না, তবে পঞ্চতন্ত্র, হিতপদেশ, কথা পরিৎসাগর, বৌদ্ধজাতক, বাইবেল বা আরয়ের ছোটকাহিনী গুলিকে ছোট গল্প রচনার প্রয়াস বলা যেতে পারে। এগুলি প্রতিটি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ছিল ধর্ম ও নীতিকথা মূলক। আধুনিক মানবরস ব্যাক্তি চেতন্য ও মননরুদ্ধতার পরিচয় এখানে নেই। ছোটগল্প বর্ণনার তার আবেদন সুদূরপ্রসারী।

ছোটগল্পের জগতে এডগার অ্যালান পো, আলজাক, মোপাসাঁ চেকভ এর পরেই প্রতিভাধর ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সমালোচকগন মনে করেন রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ছোট উপন্যাসগুলিকে বড়গল্পের পর্যায়ে ফেলতে চান। সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', দামিনীকে এই পর্যায়ে ফেললে ও তা ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি। আখ্যান থাকলেও পরিনাম ছোটগল্পের মত ন উপন্যাসের লক্ষন প্রকট। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাযাপনই' ছোটগল্পের প্রকৃত সংকেত বহন করছে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর ছোটগল্প রচনার সুত্রপাত। এইপর্বে তাঁর ছোট গল্প গুলি হল - ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ প্রনয় 'ভিখারিনী' গল্পটি লেখেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে 'ঘাটের কথা' রাজপথের কথা' ও 'মুকুট' নামে ছোটগল্প রচনা করলেন। এটি হিতবাদী' পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত হয়েছিল ল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে বিষয়বস্তু ও গঠনগত দিক দিয়ে বৈচিত্রময়তা লক্ষিত হয়। তাঁর ছোট গল্প গুলি প্রকাশিত হয়েছিল যে সকল পত্রিকায় এগুলি - 'ভারতী, 'নবজীবন' 'বালক', হিতবাদী', 'সাধনা', প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার গল্পগুলি মূলত সমাজ ও পারিবারিক সমস্যামূলক প্রকৃতি জীবন সম্পর্কীয়। যার মধ্যে পল্লীপ্রকৃতি, পদ্মার সান্নিধ্যে, জীবনের নানা সমস্যা গল্পগুলির বিষয় হয়ে উঠেছে।

২.৮. রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যশালার গতিপ্রকৃতি (১৮৫০-১৯০০)

মডিউলের এই পর্বে উনিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রঙ্গশালায় ও নাট্যসাহিত্য আলোচিত হবে। হেরাসিম লেবডোফের প্রতিষ্ঠিত পথ ধরেই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রঙ্গমঞ্চ ও পাঠ্যসাহিত্যের অগ্রগতি অব্যাহত। বিদেশীদের থিয়েটারে অভিনয় দেখে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালীরা আকৃষ্ট হয়েছিল। কলকাতার ধনীবাঙলিরা অনুপ্রানিত হয়ে সখের নাট্যশালা নির্মানে এগিয়ে আসেন। বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের হিন্দু থেয়েটার। পরে ১৮৩৫ নবীন বসুর বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয় এবং শুরু হয় নারী পুরুষ সহযোগে নাটক। ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের মধ্যদিয়ে এই শতকের দ্বিতীয় পর্বের জয়যাত্রা শুরু হয়।

১৮৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় ওরিয়েন্টাল

থিয়েটারের উদ্ভব। এর স্থায়িত্ব কাল ছিল দুই বছর। থিয়েটারে যারা অভিনয় করেছিল তাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত, দিননাথ ঘোষ প্রমুখের নামকরা যায়। ১৮৫৪ সালে প্যারীমোহন বসু তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে জুলিয়াস সীজার ইংরেজি নাটকের অভিনয় দিয়ে শুরু হল। বিদেশি অনুকরনে মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় কৌশল হতে থাকল । কলকাতার অভিজাত আশুতোষ দেবের উদ্যোগে একটি নাট্যশালার আবির্ভাব ঘটে। নন্দকুমার রায় রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকে অভিনয় মঞ্চস্ত হয়েছিল । 'মহাশ্বেতা, বানভট্টের 'কাদম্বরী' নাটকে অভিনয়ও মঞ্চস্থ হয়। এই সাতুবাবুর নাট্যশালার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল বাঙালিয়ানা যুক্ত বিদেশী রঙ্গমঞ্চে ইংরেজি নাটকে পরিবর্তে বাঙালি তৈরি নাটক অভিনয় শুরু হল।

১৮৫৮ রামজয় বসাকের নাট্যশালা, গদাধর শেঠের নাট্যশালা, চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালার সন্ধান পাচ্ছি বিদ্যাসুন্দর ও রামনারায়ন তর্করত্নের। 'কুলীনকুল - সর্বস্ব' নাটকের অভিনয় দেখা যায়।

১৮৫৬ কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে বিদোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১১ এপ্রিল শনিবার অভিনয়ের মধ্যদিয়ে রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন ঘটে। সংস্কৃত নাটকের বাংলা 'বেনীসংহার' নাটকের অভিনয় শুরু হয় । এই নাটকে কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেই অভিনয় করেছিলেন। বিদোৎসাহিনী মঞ্চে 'বিক্রমোর্বশী', 'সাবিত্রী সত্যবান', 'মালতীমাধব' মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের ব্যবস্থাপনায় বেলগাছিয়ার বাগান বাড়িতে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্য উপদেষ্টায় ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই মঞ্চে দর্শক হিসাবে এসেছিলেন তৎকালীন তারকারা যেমন - মি. হিউম, হেলিডে সাহেব, বিদ্যাসাগর, রামনারায়ন, প্যারীচাঁদ মিত্রেরা।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে চিৎপুরে রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে প্রতিসষ্ঠিত হল 'মেট্রোপলিটন থিয়েটার'। এই মঞ্চে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়েছিল । যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর । ১৮৬৫ সালে নাট্যনুরাগী যতীন্দ্রমোহনক ঠাকুরের উদ্যোগে পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে বঙ্গনাট্যশালায় প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে শুরু করে মালবাগ্নিমিত্রম, যেমন কর্ম

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তেমনি ফল , রুক্মিনীহরন, উভয় সঙ্কট অভিনীত হয়েছিল। শোভাবাজার প্রইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৮৬৫, এই সালেই ঠাকুর বাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোকে আই নাট্যশালা স্থাপিত হয়। প্রথমদিকে অভিনীত নাটকগুলি হল - বাবুবিলাস, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, নবনাটক, অলীকবাবু।

সখের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে অভিনয় চর্চার প্রসার লাভ করেছিল। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর 'ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সাধারন রঙ্গালয়ের আবির্ভাব ঘটল। এই ধরনের আত্মপ্রকাশ নিসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। থিয়েটারের অভিনয় কতিপয় মানুষের মধ্যে আটকে রইলনা বৃহত্তর জনগনের সামনে অবারিত হল। এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত প্রতিভাধর ব্যাক্তিরা হলেন - মতিলাল সুর, নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু প্রমুখ শিকইত যুবকবৃন্দ, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকের অভিনয়ের মধ্যদিয়ে ন্যাশানাল থিয়েটারের উদ্বাধন হল। একে একে 'জামাইবারিক', 'সধবার একাদশী' যেমন কর্ম তেমন ফল অভীনিত হল। এক সময় এই থিয়েটার ভেঙে দুটি থিয়েটার তৈরি হল - (ক) ন্যাশানাল থিয়েটার (খ) হিন্দু ন্যাশানাল থিয়েটার।

ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত 'নীলদর্পন' সাধারণ মানুষের চোখ খুলে ছিল। ব্রিটিশ সরকারের ও যেন টনকনড়ল, সরকার বিরোধী কোন নাটক যাতে মঞ্চস্থ না হয় তার জন্য ১৮৭৬ সালে নাট্য নিয়ন্ত্রন আইন বলবত হল। সংবাদপত্র আইনের মত নাট্য নিয়ন্ত্রন আইন স্বাধীন লেখার ও মত প্রকাশের কন্ঠরোধ করা হল। উনবিংশ শতকে সাতের দশকে সখের নাট্যশালার পাশাপাশি পেশাদার ও ব্যবসায়িক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৭ সালে গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার অধিগ্রহন করে 'ন্যাশানাল থিয়েটার' নাম দিয়ে পুনরায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এই পর্বে কিছু নাট্যলয়ের নাম হল 'বেঙ্গল থিয়েটার' শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত, প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাশানাল থিয়েটার ১লা জানুয়ারী ১৮৮১। ১৮৮৩ সালের ২১ শে জুলাই গুমুর্খ রায় প্রতিষ্ঠিত 'স্টার থিয়েটার' বিডন স্ট্রিটে এই সম্বত স্থাপিত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের মধ্যদিয়ে জয়যাত্রা শুরু হয়।

১৮৮৭ তে গোপাল লাল শীল প্রতিষ্ঠিত 'এমাএন্ড থিয়েটার' স্টার থিয়েটারের

মত এখানে ও বিখ্যাত অভিনেতারা যোগদান করেছিলেন।

১৮৮৭ সালে রাজকৃষ্ণ রায় প্রতিষ্ঠিত বীনা থিয়েটারের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ঠনঠনিয়ার নিকট মেছুয়া বাজার এলাকায় এই নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারের জন্য রাজনৃষ্ণ রায় নিজেই নাটকের রচনা করেছিলেন। চন্দ্রহাস, দ্বিতিয় প্রহ্লাদ প্রভৃতি নাটকের মধ্যদিয়ে নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও অভিনয় সকল ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

১৮৮ তে হাতীবাগানে স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। স্টার থিয়েটারর সঙ্গে যুক্তছিলেন তৎকালের দিগপালরা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ। গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত নাটকগুলি এখানে অভিনীত হয়। অমৃতলাল বসু ও রাজকৃষ্ণ রায়ের বিখ্যাত নাটকগুলিও এই মঞ্চে মঞ্চস্ত হয়েছিল সাড়ম্বরে।

(ক) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নাট্যসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি

মধ্য যুগের যাত্রা, পালা গান বা টপ্পা, ঘেউড়, রাম যাত্রার যুগ ছিন্ন করে পাশ্চাত্য প্রভাবজাত আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই বাংলা নাটকের আবির্ভাব। ১৭৯৫ সালে লেবেডফের বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনীত অনুবাদিত নাটক কাল্পনিক সংবদল (Disquise) থেকে নাটক রচনা রীতির যাত্রা শুরু হয়। ১৮৫০ এর পূর্বে সংস্কৃত ইংরেজি নাটক অনুদিত হয়ে অভিনয়ের যোগ্য করে তোলা হয়।

১৮৫০ সালের পরে বাংলায় প্রচুর পরিমানে নাটক লেখার প্রনতা দেখা দিল। এই নাট্যকারদের একটা রূপরেখা তুলে ধরা হবে এই অংশে।

দেশী - বিদেশী বিষয় অনুবাদ করে নাটক সৃষ্টি করলে হরচন্দ্র ঘোষ।

- ভানুমতীর চিত্তবিলাস - ১৮৫২ (শেক্ষপীয়ারের Marchent of venice) কৌরব বিয়োগ - ১৮৫২
- চারুমুখ - চিত্তহরা - ১৮৬৪ (অনুবাদ Romeo and Juliet)
- রজতগিরি নন্দিনী - ১৮৭৪

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রকাশ ভঙ্গি, চরিত্রের দিক থেকে নাটকগুলি প্রাঞ্চল নয়, গুনগত মনেও তেমন সন্তোষজনক হয়ে ওঠে নি।

হরচন্দ্র ঘোষের পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা বলতেই হয়। তিনি প্রহসন ও নাটক রচনা করে নাট্যসাহিত্যকে উৎকৃষ্টসাহিত্য হিসাবে দাঁড করাবার পথ দেখালেন। তাঁর রচিত নাটকগুলি

- বিক্রমোবৃশী - ১৮৫৭
- সাবিত্রী - সতভবান - ১৮৫৮
- মালতী মাধব - ১৮৮
- বাবু নামক প্রহসন

সংস্কৃত গ্রন্থথেকে তিনি বিষয় গুলি চরন করে অনুবাদ করেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত দুই রীতি গ্রহন করে নাটক রচনা করছিলেন। নাটকের চরিত্র ও সংলাপকে সহজ সরল ভাবে প্রয়োগের প্রচেষ্টা দেখা যায়। সাবিত্রী - সত্যবান নাট্যকারের মৌলিক রচনার অন্তভুক্ত।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিআসে জে. সি. গুপ্তর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদেশী রীতি অনুসরনে তিনি নাটক রচনা ঘটালেন। তাঁর রচিত প্রথম মৌলিক নাটক 'কৌর্তিবিলাস' - ১৮৫২। এটিই বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্তক নাটক। বাঙালি পরিবার জীবনের সপত্নী সমস্যা, বিমাতৃ সুলভ আচরন কেমন ট্রাজিক হয়ে উঠতে পারে তার নাট্যরূপ 'কীর্তিবিলাস'। এই সময় বাংলা মৌলিক নাটক লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তারাচরন শিকদার। তাঁর বিখ্যাত নাটক ভদ্রার্জুন - ১৮৫২ এটি ও পাশ্চাত্য রীতির অনুসরন রচিত নাটক। মহাভারতের অর্জুন ও সুভদ্রার কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি লেখা হয়েছে। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' - ১৮৫৬ এটি সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত।

বিক্ষিপ্ত দু-একটি নাটক রচনায় ধারাবাহিক নাটক রচনা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবণতা বাংলা নাট্য সাহিত্যে দেখা দিল। ১৮৫০ - ১৯০০ সালের মধ্যে প্রথমে রামনারায়নের নাম করতেই হয়। নাট্যমঞ্চস্থ ও নাট্য সাহিত্যিক সমৃদ্ধ করেছিল তার রচনা সমূহ। 'রামনারায়ন তর্করত্ন' (১৮২২-৬৬) রচিত নাটক

- সমাজ - সমসভা মূলক নাটক

    কুলীন কুল সর্বস্ব - ১৮৫৮

    নব নাটক - ১৮৬৫

- অনুদিত নাটক

    বেনীসংহার - ১৮৫৩

    রত্নাবলী - ১৮৫৮

    অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ - ১৮৬০

    মালতী মাধব - ১৮৬৭

- পৌরানিক নাটক

    রুক্মিনীহরণ - ১৮৭২

    কংসবধ - ১৮৭৫

    ধর্মবিজয় - ১৮৭৬

এছাড়া প্রহসন গুলি হল

    যেমন কর্ম তেমন ফল

    পীরস্থান

    মুস্তফি সাহেব কা পাকা তামাসা

    বাজার কুঘটন

    চক্ষুদান - ১৮৬৯

    উভয় সঙ্কট - ১৮৬৯

নাটুকে রামনারায়ন এমন ভিন্ন স্বাদের নাটক প্রহসন রচনা করে নাট্যকার হিসাবে যেমন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন তেমনি সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিলেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে কৌলিন্য প্রথার কুফল কত বিষময় হতে পারে তা দেখানো

টিপ্পনী

টিপ্পনী

হয়েছে। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লিখলেন 'নবনাটক'। এছাড়া তিনি বহু অনুবাদ ও পৌরানিক নাটক রচনা করলেন।

(খ) মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)

নামমাত্র অনুবাদিত নাটক ও গতানুগতিকতা চেখে মধুকবি স্থির থাকতে পারলেন না। হাত দিলেন নাটক রচনা তে। বঙ্গনাট্য রচনার এমন দৈন্যদশা বিদুরনে ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে।

নাট্যসমূহ

পৌরানিক নাটক

শর্মিষ্ঠা-১৮৫৯

পদ্মাবতী-১৮৬০

ঐতিহাসিক নাটক

কৃষ্ণকুমারী-১৮৬০

প্রহসন

একেই কি বলে সভ্যতা-১৮৬০

বুড়োশালিখের ঘাড়ে রোঁ

রূপক নাটক

মায়াকাল

বিষনা ধনুর্ত্তন

মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নিয়ে নাটক দেখে খেদ প্রকাশ করেছিলেন।

১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটক দেকার পর প্রথম পৌরানিক নাটক 'শর্মিষ্টা' রচনা করলেন। সংস্কৃত ও বিদেশী বিশেষত শেক্সপীয়ারের নাট্যআদর্শকে অবলম্বন করে শর্মিষ্ঠা রচনা করলেন। নতুন নাটক আদর্শ কে অবলম্বন করে শর্মীষ্ঠা রচনা করলেন। নতুন নাটক পেয়ে জনমানসে বিপুল আলোড়ন জাগল। অভিনন্দনের পুষ্প বর্ষিত হল মধুসূদনেকর শিরোপারে। তাঁর পরবর্তী নটক গ্রীক 'Apple of Discord' অনুসরনে 'পদ্মাবতী'। শর্মিষ্টার দুর্বললতা 'পদ্মাবতী'তে লক্ষিত হয় না। তিনি অনেক বাস্তবযুগ ও নাট্যরীতি ও প্রয়োগরীতি অনুসরন করেছিলেন এবং চরিত্র প্রাপ্তি হয়ে উঠে ছিল।

মধুসূদন একটি মাত্র ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। তিনি টড়ের Anals Antiquits of Rajasthan থেকে আখ্যানত্যাগ গ্রহন করে শ্রেষ্ঠকীর্তি কৃষ্ণকুমারী রচনা করলেন।

প্রতিভারধর প্রাচ্য - পাশ্চাত্য ভাবধারা পুষ্ট মধুবি মৌলিক প্রহসন রচনা করলেন। তৎকালীন সমাজের ব্যাভিচার লাম্পট্য কে তুলে ধরলেন তাঁর প্রহসনে। 'একেই কি বলে সভ্যতায়' ইযংবেঙ্গল নামক ডিরেজিও পন্থী নব্য তরুন দলের কালাপাহাড়ী উদ্দামতা মাদকাসক্তি, ধর্মবিদ্বেষী, বেহোময়ান জীবনযাপনের চিত্র এঁকেছেন প্রহসন। মধুসূদন বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ তে প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের দন্ডমুন্ডের মাথাদের বেহায়াপনার প্রতি কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে। ভক্তপ্রসাদ হানিফ ফতেমা চরিত্রগুলিকে মধুসূদন তার প্রহসনে জীবন্ত করে রেখেছেন। আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ সবার নজর কেড়েছিল। ভক্তপ্রসাদের মত ভোগলালসা মত্ত বৃদ্ধ চরিত্র সমাজের মর্মচক্ষু খুলেদিল। মধুসূদন এমন ব্যঙ্গাত্মক চিত্র রচনা করে নাট্যসৃষ্টির নৈপুন্যের পরিচয় দান করলেন।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩)

'নীলদর্পনের' রূপকার দীনবন্ধু মিত্র মাইকেল মধুসূদনের প্রভায় প্রভাবতি হয়ে নাট্য সাহিত্যে পদার্পন। গ্রামবাংলার সহজ সরল কুটিল নানা রকম কুসংস্কার নাগপাশ বন্ধন ও মানুষের জীবনের সাধারন বিষয় নাটক প্রহসনের বিষয় করে তুললেন।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

রচিত গ্রন্থসম্ভার

নাট্যগ্রন্থ

নীলদর্পন - ১৮৬০

নবীনতপস্বিনী - ১৮৬৩

কমলে কামিনী - ১৮৭৩

প্রহসন

সধবার একাদশী - ১৮৬৬

বিয়েপাগলা বুড়ো - ১৮৬৬

লীলাবতী - ১৮৬৭

জামাইবারিক - ১৮৭২

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ছয়ের দশকে 'নীলদর্পন' (১৮৬০) নাটক রচনার মধ্যদিয়ে তার স্বমহিমায় প্রকাশ। এমন একটি দেশের জ্বলন্ত বিষয়কে অবলম্বন করে নাটক লিখলেন যা সমগ্র বঙ্গের প্রানে যা এত দিন শাসকের ভয়ে অবদমিত ছিল। সেই বিষয়কেই নাটভরূপ দিলেন। নীলকর সাহেবদের প্রবল অত্যাচারের কাহিনী জনসমক্ষে আনলেন। মানুষের মনে এক বিপ্লবী ভাবধারার জন্মনিল ভাষা দিল দীনবন্ধুর নাটক 'নীদর্পন'। নীলকরদের অত্যাচারের বিভৎসরূরূপ সমগ্র বিশ্ব জানতে পারল। আর তাতে আরো সর্বজনের সামনে তুলে ধরতে লঙ সাহেব সাহায্য করলেন 'The Indigo plant on and Mirror'-A native অনুবাদের মধ্য দিয়ে।

নীলদর্পনের চরিত্রগুলি গ্রামীন জীবনথেকে উঠে আসা বাস্তব মাটির সংলাপ মুখে নিয়ে গোলক বসু, তোরাপ, রাইচরন, আদুরী, পদীময়রানীর মত চরিত্র গুলি বাস্তবতার ভূমি স্পর্শ করেছে। 'নীলদর্পন' কে 'Onele Tome's Cabin' এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। পরবর্তী নাটক গুলিতে এমন মর্মন্তুদ কাহিনী লক্ষিত হয় না। 'নবীনতপশ্বিনী', 'কমলে কামিনী' রোমান্টিক প্রনয়মূলক কাহিনী অবলম্বনে রচিত

নাটক । প্রহসন রচনায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'বিয়েপাগল বুড়ো' - প্রহসনটি চারিত্রিক দুর্বলতার কেন্দ্র করে কৌতুক ও ব্যঙ্গ প্রকাশিত এটি মধুসূদনের প্রহসনের প্রভাব জাত। পরবর্তি নাটক 'জামাই বারিক' এ সম্ভ্রান্ত পরিবারে ফুটেছে এই নাটক ল জামাইদের আচরন, সতীনদের ঝগড়া নিয়ে কৌতুকরস সৃষ্টি করেচেন । সধবার একাদশী' প্রসনে কলকাতা নগরির শিক্ষিত - অর্ধ শিক্ষিত বাবুদের লাম্পট্য, মাদ্যাশক্তি, পরস্ত্রিহরণ এমন সামাজিক ও চারিত্রিক স্খলন নাটকে চিত্রিত ল নিমচাঁদ চরিত্রটি তৎকালীন যুগজীবনের প্রতীক।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকের অভিনয় দিয়ে 'ন্যাশানাল থিয়েটারের' শুভ উদ্বোধন হল। নীলদর্পনের নাটক অভিনয়ে সাধারন মানুষের মধ্যে নীলকরদের অত্যাচার মানুষের করুন মর্মন্তুদ কাহিনী চোখের সামনে এল। অন্যান্য নাট্যশালায় মধুসূদনের মত দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলি সাড়ম্বরে অভিহত হয়ে জনসমাজে সাড়া ফেলেছিল। এই সময়ের নাট্যকাররা শুধু সময়কাটানো বা আনন্দ উল্লাসের জন্য নাটক প্রহসন লিখলেন না। সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি অত্যাচার শোষন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ও তাদের সেচ্চার হতে দেখি।

১৮৫১ - ১৯০০ সাল পর্যন্ত আরো কিছু নাট্যকার তাদে নাট্য প্রতিভার যে পরিচয় দিয়েছিলেন তা আলোচিত হবে।

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য মনোমোহন বসু। তিনি বাংলা নাটককে পুরনো মাত্রার ঢঙে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন।

রচিত নাটকগুলি

প্রণয় পরীক্ষা - ১৮৬৯

আনন্দময় - ১৮৯০

ভক্তিরসাত্রিক পৌরানিক নাটক

রামাভিষেক - ১৮৬৭

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সতী - ১৮৭৩

হরিশচন্দ্র - ১৮৭৫

রাসলীলা - ১৮৮১

প্রহসন

নাগাশ্রমের অভিনয় - ১৮৭৫

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮ - ১৯২৫)

তাঁর রচিত নাটক প্রহসন গুলি হল -

পুরুবিক্রম - ১৮৭৪

সরোজিনী - ১৮৭৫

অশ্রুমতী - ১৮৭৯

স্বপ্নময়ী - ১৮৩২

হঠাৎ নবাব - ১৮৮৪

দায়ে পড়ে দারগ্রহ

কিঞ্চিৎ জলযোগ - ১৮৭২

এমন কর্ম আর করব না

অলীকবাবু

হিতে বিপরীত

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯ - ৯৪)

তিনি পৌরানিক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন, সে গুলি হল

অনলে বিজলী - ১৮৭৮

তারক সংহার - ১৮৮০

হরধনুভঙ্গ - ১৮৮২

যদুবংশ ধ্বংস - ১৮৮৪

তরনীসেন বধ - ১৮৮৪

চন্দ্রহাস - ১৮৮৮

রাজা বিক্রমাদিত্য - ১৮৮৪

মীরাবাঈ - ১৮৮৯

রনবীর - ১৮৯২

কিরনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

লিখিত নাটক

ভারতমাতা - ১৮৭৩

ভারতের যবন - ১৮৭৪

হরলাল রায়

তাঁর দুটি নাটক হল

হেমলতা - ১৮৭৩

বঙ্গের সুখাবসান - ১৮৭৪

উপেন্দ্র নাথ দাস

তাঁর রচিত নাটক

শরৎ সরোজিনী - ১৮৭১

সুরেন্দ্র বিনোদিনী - ১৮৭৫

দাদা ও আমি - ১৮৮

টিপ্পনী

টিপ্পনী

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকজন প্রতিভাধর নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাংলার গ্যারিক একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা পরিচালনা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতা ও অভিনয় শিক্ষক রূপে তার খ্যাতি সর্বত্র। তিনি গীতিনাট্য ও রচনা করে সাড়া ফেলেছিলেন। এছাড়া সামাজিক, পৌরানিক, ঐতিহাসিক, পঞ্চরং রচনা করে নাট্যমঞ্চ ও নাটভসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছেন।

নাট্যসম্ভার

গীতিনাট্য

আগমনী - ১৮৭৭

অকালবোধন - ১৮৭৭

মোহিনী প্রতিমা - ১৮৮৮

পৌরানিক নাটক

রাসলীলা - ১৮৮১

রাবনবধ - ১৮৮১

সীতারবনবাস - ১৮৮১

অভিমন্যুবধ

কমলেকামিনী - ১৮৮২

জনা - ১৮৯৩

পান্ডব গৌরব - ১৯০০

ঐতিহাসিক নাটক - এই নাটক গুলি সবই বিশ শতকের রচনা।

সামাজিক নাটকের মধ্যে কয়েকটি উনবিংশ শতকের রচনা তা হল -

প্রফুল্ল - ১৮৮৯

হারানিধি-১৮৯০

মায়াবসান-১৮৯৮

টিপ্পনী

এছাড়া বিখ্যাত 'বলিকান', 'শাস্তি কি শাস্তি' বিশশতকের রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত পঞ্চরং গুলি যুগ সন্ধিক্ষনে রচিত। যেমন 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বৈল্লিক বাজার', 'সভ্যতার পান্ডা' প্রভৃতি।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষনে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের কিছু বিখ্যাত নাটক পাচ্ছি যা পরবতর্তী পযর্যায়ে আলোচিত হবে।

রামনারায়ন তর্করত্ন, মধুসূদন, দীনবন্ধুমিত্র যে নাটক প্রহসন রচনার পথ দেকিয়ে ছিলেন সেই পথেই আসল বাংলা সাহিত্যে নাট্যরচনার জোয়ার। নাটক রচনার নানা বিষয় আঙ্গিক তার পরীক্ষা নিরীক্ষা আজো হয়ে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই এই বাংলা নাটক রচনার সুত্রপাত।

আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১। রামনারায়ন তর্করত্নের নাটক গুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। নাট্যকার মধুসূদনদত্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৩। নাট্যকার ও প্রহসনকার দীনবন্ধু মিত্রের পরিচয় দাও।

২.৯. কাব্য - কবিতা, আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যের সমৃদ্ধির কাল

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশশতকে শুরুতেই যে সকল কাব্য কবিতা, আখ্যান কাব্য, মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে তা এই পর্বে আলোচিত হবে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে পথ খনন করলেন তার পথ ধরে আধুনিক কাব্য - কবিতা, আখ্যান কাব্য, মহাকাব্যের বিকাশ ও বিস্তার। ১৮৫০ - ১৯০০ পর্যন্ত যে সকল কবিরা তাদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাদের প্রথম আলোচিত হবে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের কবিত্ব।

টিপ্পনী

(ক) রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭)

ঈশ্বর গুপ্ত পরবর্তী আধুনিক কবিদের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় অন্যতম। সংবাদ প্রভাকরের রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কাব্য কবিতায় প্রবেশের পূর্বে কবিগানের দলে গান বাঁধতেন বলে সংবাদ প্রচলিত।

রচিত গ্রন্থ সমূহ

ভেক মূষিকের যুদ্ধ - ১৮৫৮

পদ্মিনী উপাখ্যান - ১৮৫৮

কর্মদেবী - ১৮৬২

শূরসুন্দরী - ১৮৬৮

নীতিকুসুমঞ্জলি - ১৮৭৫

কাঞ্চীকাবেরী - ১৮৭৯

রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ইতিহাসশ্রয়ী কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাব্য গুলি লোক প্রচলিত গল্প, কিংবদন্তী ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে গড়ে তুলেছেন। 'কর্মদেবী' কাব্যটি যশলমীরের স্বাধীনতার বিজয়গাথা চিত্রিত। সাধুর দেশপ্রেম স্বাধীনতা লাভের দুঃসাহসিক বীরত্বের পরিচয় এখানে লভ্য। কাহিনী বীররসকে আশহরয় করে রোমান্স ভাবনায় পুষ্ট। বিদেশী কবিদের প্রভাব কর্মদেবীতে স্পষ্ট, যেমন সকট, বায়রন প্রমুখ। 'কর্মদেবী' যেমন যশলমীরের বীরত্বের গাথা তেমনি সূরসুন্দরী রাজপুত বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে।

এই কাব্যে আকবরের হিন্দু নারী লোলুপতার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। রঙ্গলাল এই কাব্যে হিন্দু নারীর মর্যাদা ও সতীত্বের বিজয় ঘোষনা করেচেন। মুসলমান প্রতিরোধের এক কাহিনী তিনি তুলে ধরলেন কাব্যস্থানে। 'কাঞ্চীকাবেরী' প্রচলিত লোককাহিনীর সঙ্গে উড়িষ্যার রাজকাহিনীর সংমিশ্রনে গড়ে ওঠা কাব্য। পুরুষোত্তম ও কাঞ্চিরাজের বিবাদ এবং কাব্যের অন্তিমে বিবাহের মধ্য দিয়ে দুই রাজার সংঘর্ষের ইতি ঘটে। বিদেশী প্রেরণায় এবং টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থ থেকে বিষয় উৎস গ্রহন করে রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনা কলেন। এই

কাব্যের মূলবিষয় সম্রাট আলাউদ্দিন কতৃক চিতোর আক্রমন এবং পদ্মিনী লাভের বাসনা। সতীত্ব রক্ষার্থে জহরব্রতে প্রান বিসর্জন যা রাজস্থানবাসির বীরত্বের গৌরব গাথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। এই আত্মত্যাগ শৌর্যবীর্য ইতিহাস সাপেক্ষ।

টিপ্পনী

উপরিক্ত কাব্যগুলি ছাড়াও 'নিতিকুসুমাঞ্জলি' নামক নীতি ও তত্ত্বমূলক কবিতার অনুবাদ করেছিলেন । রঙ্গলাল বিদেশী কবিদের পাশাপাশি সংস্কৃত ও প্রাদেশিক কবিদের প্রেরনা ও অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের ধারাকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

(খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ৭৩)

বাংলা কাব্য কবিতা ও মহাকাব্যে রচনার ধারাকে এক নব চেতনার আলোকে তুলে ধরলেন। দেশী - বিদেশি প্রভাব তাঁর কাব্য কবিতায় প্রভাব ফেলেছে তেমনি মধুসূদনের নিজস্ব কল্পনা ও মননের প্রভাবে সাহিত্যগুলি বিশ্ব সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

রচিত গ্রন্থ

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য - ১৮৬০

মেঘনাথবধ কাব্য - ১৮৬১

ব্রজাঙ্গনা কাব্য - ১৮৬১

বীরাঙ্গনা কাব্য - ১৮৬২

চতুর্দশপদী কবিতাবলী - ১৮৬৬

Captive Ladie - 1849

Visions of the past - 1849

Tilottama (incoplete), Queen Seeta (Incomplete) প্রভৃতি।

টিপ্পনী

পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ, অমিত্রাক্ষর ছন্দে দেহে ধারন করে মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনার মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যে পদার্পন। তিলোত্তমা কে কেন্দ্র করে সুন্দর - উপসুন্দরের বীরত্বপ্রকাশ। তাদের ব্যাভিচার এবং শেষপর্যন্ত বিনাশ সাধন দেখানো হয়েছে। নারীর মোহিনী - শক্তিকে সৌন্দযফের অধিষ্ঠাত্রী দেবীতে প্রকাশ করাহয়েছে। পাক পাশ্চাত্যের গভীর প্রভাব জাত এক সাহিত্যিক মহাকাব্য তিনি লিখলেন যা বিশ্বসাহিত্য সম্ভারের নতুন পালক সংযোজনের হাত তা মেঘনাথবধ কাব্য। সাহিত্যিক মহাকাব্যের সমস্ত শর্ত মেনে আধুনিক মননের পরিচয় প্রদান করলেন মেগনদবধ কাব্যে। তাঁর কাব্যে বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাস, হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিলটন, ট্যাশের মত সাহিত্যিকদের কাব্যরস আরোহন করে গড়ে তুললেন নতুন আঙ্গিকের মহাকাব্য। ইংরেজিতে কাব্যরচনা শুরু করলেও বাংলায় এসে তার প্রতিভার বিচ্ছুরন ঘটালেন। মেঘনাদবধ যেমন ভাষার গামম্ভীর্য তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহন হিসাবে মহাকাব্যকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে, চরিত্র সৃষ্টিতে দেশী- বিদেশী প্রভাব বর্তমান আর মধুসুদন নিজের প্রিয় পাত্রকে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বিজয়মালা পরিয়েছেন। মাবতার জয়গানে তার কাব্য মুখরিত। মেঘনাদবধ কাব্যের সকল ক্ষেত্রেই নতুনত্বের প্রকাশ বর্তমান।

কবি মধুসুদন ইতালীয় 'Ottaia Rima' ছন্দের অনুকরনে 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য রচনা করলেন। মানব - মানবীর লিরিক ধর্মী জীবনলীলা এই কাব্যের বিষয়। 'বীরাঙ্গনা কাব্যটি ইতালীয় কবি ওভিড়ের Heroidies পত্রকাব্যের অনুসরনে রচিত। প্রতিটি পত্র যেন নায়িকাদের হৃদয়মথিত বুভুক্ষু থেকে উঠে আসা। Sonet এর পেত্রার্কীয় ভাবনা আত্মীকরন করে চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নির্মান করলেন।

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৯০৩)

মধুসুদনের পরেই হেমকচন্দ্রের স্থান। তিনি কাব্য, গীতি, কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা, মহাকাব্য ও দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখে সাহিত্য জগতে অনন্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তাঁরগ্রন্থসমূহ

চিন্তাতরঙ্গিনী ১৮৬১

বীরবাহুকাব্য - ১৮৬৪

আশা কানন - ১৮৭৬

ছায়াময়ী - ১৮৮০

দশমহাবিদ্যা - ১৮৮২

চিত্তবিকাশ - ১৮৯৮

বৃত্রসংহার - ১৮৭৫ - ৭৭

এছড়া কবিতাবলীর সংকলন প্রকাশ করেছিলেন।

হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' একটি কাল্পনিক আখ্যান কাব্য 'আশাকানন' রূপক কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। চিন্তা তরঙ্গিনী একটি শোক কাব্য। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার অন্তরালে আছে দেশাত্মবোধ যা স্বাধীনতাকামী ভারতবাসির কাছে উদ্দীপনাময় তো বটে।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭ - ১৯০৯)

হেমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী নবীনচন্দ্রসেন। তার কবিতার মধ্যে আছে ভক্তি স্বদেশপ্রেম ও রোমান্স এক অপূর্ব সমাহার ইনি আখ্যান কাব্য বা মহাকাব্য ও রচনা করলেন যার মধ্যে স্বদেশানুরাগ ও মানবজীবনের জয়গাথা প্রাধান্য পেল।

রচনাসমূহ

অবকাশরঞ্জিনী - ১৮৭১ - ৭৮

পলাশীর যুদ্ধ - ১৮৭৫

ক্লিও পেট্রা - ১৮৭৭

রঙ্গমতী - ১৮৮০

খ্রীষ্ট - ১৮৯১

অমিতাভ - ১৮৯৫

অমৃতাভ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এছাড়া তার রচিত বিখ্যাত ত্রয়ী মহাকাব্য -

রৈবতক - ১৮৮৭

কুরুক্ষেত্র - ১৮৯৩

প্রভাস - ১৮৯৬

(গ) বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী (১৮৩৫-৯৪)

বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী গীতিকবিতার একান্ত সাধক। কবিহৃদয়ের সেই অনির্দেশ্য বেদনকা, সঙ্গীতময়তা, প্রানের স্বতস্ফূর্ত আবেগ বিহ্বলতা তাঁর কাব্যকে অমরতা দান করেছে। ভোরের পাখি বিহারীলাল বাংলা সাহিত্যে স্থায়ি আসন দখল করেছেন।

রচনা সম্ভার

স্বপ্নদর্শন - ১৮৫৮

সংগীত শতক - ১৮৬২

বন্ধুবিয়োগ - ১৮৭০

সারদামঙ্গল - ১৮৭৯

নিসর্গসন্দর্শন - ১৮৭০

সাধের আসন, বাউল বিংশতি - ১৮৮৭

বঙ্গসুন্দরী - ১৮৭০

বিহারীলালের স্বপ্নদর্শন একটি কগদ্যরূপক কাব্য। তাঁর অনেক কাব্যে নারী ও প্রকৃতি এক হয়ে বন্দিত। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য ও বিস্ময় নারীর দুরুহ গহন মনের অন্তরালে যে চিত্রিত বঙ্গসুন্দরী নারী এক প্রেমের প্রতিমা, যিনি সংসারে উপস্থিত তিনিই আবার স্নেহের অমৃত সাগর, করুনার নির্বারনী, দয়ার স্রোতসিনী, তিনি কবির 'সারদামঙ্গলের' 'মানসমরালী মম আননদ্ রূপনি'। তাকে কেন্দ্র করে কবির আনন্দ - হাসি - কান্না - বিরহের বিচিত্র রোমান্টিক অনুভূতি 'সারদামঙ্গল' ত্রিবিধ বিরহের ফলে সৃষ্টি তিন বিরহ - মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ ও সরস্বতী বিরহ। এই শ্রেষ্ঠ কাব্যে ক্রৌঞ্চ -

মিথুন হাহাকার জনিত বাল্মীকির মত শোকাহল কাহিনী দিয়ে শুরু পরে বৈষ্ণবীয় আনন্দময় অন্বেষন তৃতীয় পর্বে আপন হৃদয়ে তার উপলব্ধি পরবর্তী পর্বে আনন্দঘন অবস্থায় পৌঁছানো। এমন রোমান্টিক ভাবঘন পরিবেশে আনন্দ রূপনীকে বলেন-

টিপ্পনী

জ্যোতির প্রবাহ মাঝে বিশ্ববিমোহিনী রাজে।
কে তুমি লাবন্য - লতা মূর্তি মধুরিমা।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি বিলাও অমৃত - রাশি,
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা!

বিহারীলালের ব্যাক্তি ক্রিয়ার প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন-

ভালবাসি নারী নরে
ভালবাসি চরাচরে
ভালবাসি আপনারে মনের আনন্দে রই।

এ এক স্বর্গীয় অনুভুতি। সুখ দুঃখ ব্যাক্তিগত অনুভূতি সর্বজনীন প্রমানুভূতিতে মূর্ত।

কবিগুরুর বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু ও বিহারী লালের কবি চিত্তর তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দশসর্গের কাব্য 'সাধের আসন', 'নিসর্গ - সন্দর্শন' আট সর্গে বিভক্ত চতুষ্পদী স্তবকে সরল ভাষায় রচিত কাব্য। প্রকৃতি ও মানব সংক্রান্ত বিষয় এর লক্ষ্য। 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যটি বিহারীলালের শোককাব্য পর্যয় ভুক্ত। কবির প্রথম পত্নীর প্রয়ান ও বাল্যকালের চারবন্ধুর বিয়োগ যন্ত্রার কাব্য 'বন্ধুবিয়োগ'। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও তাঁর অনুবর্তী কবিদের সম্পর্কে সুকুমার সেন বললেন-

"বিহারীলাল চক্রর্ত্তি ও তাঁর অনুবর্ত্তী রোমান্টিক কবিরা কেবল গভীর অন্তমুখীনতার জন্যই নয়, প্রণয়, বিশেষত নারীপ্রেম এবং ভাববন্ধনের জন্যও বিশিষ্ট । জীবনের সমস্যাগুলি ক্লাসিকপন্থীরা যে চোখে দেখতেন এঁরা ঠিক সে দৃষ্টিতে দেখতেন না।"

টিপ্পনী

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮)

বিহারীলালের যুগের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি প্রথমে ক্লাসিক ধারার কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বিহারিলালের কাব্যের প্রবল প্রভাব এড়ান সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি রোমান্টিক প্রেমের কবি হয়ে উঠেছেন।

বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ

মহিলা কাব্য - ১৮৭০ - ৭১ (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এই বিখ্যাত কাব্য।

এছড়া তাঁর রচিত কাব্য গুলি হল

ষড়ঋতুর বর্ণন -

মাদক - মঙ্গল - ১২৭৪

বিহারীলালের অনুপ্রেরনাজাত 'মহিলাকাব্য'। কাব্যটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। নারীকে তিনি তিন বন্দনায় এঁকেছেন কাব্যে - মাতা, জায়া ও ভগিনী। কবি মনের বিশ্বাস পুরুষের যে বর্তমান রূপ তা স্ত্রীলোকেরই তৈরি আর এই গড়া রূপই স্বর্গরাজ্যে পৌঁছাতে বিশেষ সাহায্য করেছে।

কবি সুরেন্দ্রনাথ ছাড়াতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে লেখা কাব্য কবিতার কয়েকজন কবিদের নাম উল্লেখ করা যায়। যেমন - শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রাজাকৃষ্ণরায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রমুখেরা। উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম কাল থেকেই সাহিত্যের আসরে হাত পাকাতে শুরু করেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং মানকুমারী বসু ও কামিনী রায়ের মত প্রতিভাধর মহিলা কবিরা ও।

উনবিংশ শতকে কবি শুরু রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতিপর্ব, উন্মেষপর্ব ও ঐশ্বর্যপর্বের কাব্যগ্রন্থ গুলি প্রকাশিত হতে দেখা যায় -

যেমন

অভিলাষ - ১২৮১

পৃথিবীর পরাজয়, হিন্দুমেলার উপহার - ১৮৭৫

প্রভাবসঙ্গীত - ১৮৮২

ছবি ও গান - ১৮৮৪

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী - ১৮৮৪

কড়ি ও কোমল - ১৮৮৬

সোনারতরী - ১৮৯৪

চিত্রা - ১৮৯৬

চৈতালী - ১৮৯৬

প্রথম দিককার কাব্যগুলি তাঁর প্রথম প্রয়াস তাই লেখার মধ্যে দুর্বলতা বর্তমান তা তিনি স্বীকার করেছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে মানসি, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালী তাঁর ঐশ্বর্য পর্বের কাব্য। নিসর্গ প্রকৃতি প্রেম এক নব ধারার আনায়ন। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের এক আলোকময় পদার্পন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আর্যগাথা (১৮৮২ - ১৮৯৩)। আষাঢ়ে (১৮৯৯) প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে আরো কয়েকটি বিখ্যাত কাব্যের সন্ধান পাচ্ছি তার মধ্যে মহিলাকবি রচিত - মানকুমারী বসুর - কাব্যকুসুমাঞ্জলি (১৮৮৩), প্রিয়প্রসঙ্গ (১৮৮৪), যামিনী রায়ের - আলো ও ছায়া (১৮৮৯), নির্মাল্য (১৮৯০), পৌরানিকী (১৮৯১ - ৯২), গুঞ্জন (১৮৯৯)।

আত্মমূল্যায়ন প্রশ্ন

১। বাংলা সাহিত্যে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব লেখ।

২। কবি মাইকেল মধুসূদনের কাব্য কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৩। ভোরের পাখি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যের ভূবন পর্যালোনা কর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

২.১০. বাংলা সাময়িক পত্র পত্রিকার অগ্রগতি

বাংলা সাময়িক পত্র পত্রিকার অগ্রগতি উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ তাৎপর্যপূর্ন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের। বিবিধার্থ সংগ্রহ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশের মধ্য দিয়ে দ্বীতীযার্ধের জয়যাত্রা শুরু হল। প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। এই পত্রিকায় প্রানীবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, শীল্প সাহিত্য বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হল। এই পত্রিকা নিজস্ব একটা সাহিত্যিক পরিমন্ডল গড়েছিল যার রচনার ভিন্নতাই তার প্রমাণ। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' সাহিত্য, বানিজ্য দ্রব্য, সমালোচনা, খাদ্য বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও এই পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেছিলেন বেশ কিছুদিন। ১৮৫২ তে প্রকাশিত পত্রিকা গুলি হল - 'বিদ্যারত্ন', জ্ঞানরুনোদয়, 'সংবাদ শশধর', সংবাদ বিভাকর'। ১৮৫৩ - ৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত পত্রিকা - 'ধর্মরাজ' সুলভ পত্রিকা, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'। মাসিক পত্রিকায় নারীসমাজের জন্য বিশেষ স্থান ছিল। এছাড়া সহজ সরল গদ্যরিতির প্রচলনে হাজির হলেন 'আলালের ঘরের দুলাল' নিয়ে টেক চাঁদ ঠাকুর। ১৮৫৫ - কালীপ্রসন্ন সিংহের যোগ্য সম্পাদনায় 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এবছরই মাসিক 'সর্ব্বার্থপূর্নচন্দ্র' পাক্ষিক 'বঙ্গবার্তাবহ', সাপ্তাহিক জ্ঞানবোধিনী' প্রভৃতি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচরন সরকারের 'এডুকেশন গেজেট' ও 'সাপ্তাহিক বার্তা'।

১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহের উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। এবছর প্রকাশিত হল মাসিক 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' সাপ্তাহিক 'হিন্দুরত্নকমলাকর' প্রভৃতি পত্রিকা। তবে লর্ড ক্যানিং এর কোপে পড়ে কয়েকটি পত্রিকার প্রকাশ স্তব্ধ হয়ে যায় তার মধ্য কালীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' এবং বিখ্যাত 'রঙ্গপুর বার্তাবহ'। ১৮৫৮ সালে বহুপত্রিকার জন্ম হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - 'কলিকাতা পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি। সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষন। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হল বিহারীলাল চক্রবর্তীর মাসিক 'পূর্নিমা' ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কবিতাকুসুমাবলী', 'বিজ্ঞান কৌমুদী', 'দৈনিক পরিদর্শক' কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'ঢাকাপ্রকাশ (১৮৬১), শুভকরী, অবকাশরঞ্জিকা প্রভতি।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৬৩ সালে প্রকাশ পায় মাসিক 'রহস্যসন্দভফ'। হরিনাথ মজুমদারের 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের

মাসিক 'অবোধবন্ধু' পপত্রিকায় বহু বিশিষ্ট মানুষেরা যুক্ত ছিলেন। উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পপাদনায় 'বামাবোধিনী' ১৮৬৪ সালে কাব্য প্রকাশ, শিক্ষা দর্পন, পরিদর্শন, ভারতরঞ্জন। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত সত্যান্বেষন, হিন্দুহিতৈষিনী, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি। ১৮৬৮ হিতসাধক, ১৮৬৯ সালে সাপ্তাহিক 'বঙ্গদুত' অবলাবান্ধব, প্রভৃতি। ১৮৭০ এ মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গমহিলা'র আত্মপ্রকাশ। পত্রিকা প্রকাশে বাংলার মহিলারাও পিছিয়ে রইল না। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সমাজ সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হল। চিন্তা - চেতনায় এই পত্রিকা আনল নতুনত্ব এবং রুচিসম্মত চিন্তাশীল লেখক গোষ্ঠীর জন্ম ঘটল । বঙ্গদর্শনের পাশাপশি মাসিক 'জ্ঞানমঞ্জুর', সমাজদর্পন' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হল।

১৮৭২ এ বঙ্গদর্শন থেকে ১৮৭৮ সালের সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার' এর মধ্যবর্তি উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি ১৮৭৪ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভ্রমর'। মীরমশারফ হোসের 'আজীবন নেহার'। বান্ধব, রমেশচন্দ্রের 'জীবনপ্রভাত' প্রভৃতি । ১৮৭৫ 'বঙ্গমহিলা', 'বিনোদিনী, ১৮৭৭ সালে ঠাকুরবাড়ির লোকেদের সম্পাদনায় 'ভারতি' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৮৭৯ খ্রী. থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে উল্লেকিযোগভ পত্রিকাগুলি ১৮৭৯ 'প্রভাতী', বিশ্বস্ত প্রভৃতি। ১৮৮১ তে 'সচিত্র বিজ্ঞান দর্পন', জ্ঞানেন্দরলাল রায়ের 'বঙ্গবাসী। ১৮৮৫ সালে জ্ঞানদানন্দিনীর সম্পাদনাব 'বালক'। ১৮৮৯ সালে 'শিক্ষা পরিচয়', সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য'। ১৮৯০ সালে হিতকরী, জন্মভূমি এবং বৈষ্ণবধর্মপ্রচার ও প্রসারে বিষ্ণুপ্রিয়া।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাধনা' এবং কষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'হিতবাদী' এই পত্রিকার সাহিত্য বিষয়টি রবীন্দ্রনাথই দেখতেন আর সাধনার বেশির ভাগ লেখাই ছিল রবীন্দ্রনাথের। ১৮৯৩ এ মাসিক 'সাথী' নামে একটি শিশুপত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি সচিত্র সাহিত্যগুন সম্পন্ন ছোটোদের পত্রিকার আত্মপ্রকাশ । ১৮৯৭ 'সাবিত্রী', 'প্রদীপ', 'বিনোদিনী'র মত পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে ছিল। ১৮৯৮ সালে 'সংসার', 'মালা' প্রভৃতি। ১৮৯৯ সালে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে জাগরিত হ। পাক্ষিক 'উদ্বাধন' পত্রিকা। ১৯০০ সালে প্রকাশিত হল আরো কয়েকটি নতুন পত্রিকা।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

'বঙ্গদর্শন' আবির্ভাব থেকে বাংলা সাহিত্যের সুবর্নযুগের আগমন ঘটল। পত্রিকাগুলিই বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতির ধারাকে পুষ্টিদানে সাহায্য কল। পত্রিকার মধ্যদিয়ে সমগ্রজনগনের কথা। রাজনৈতিক অবস্থান, কৃষি, সংস্কৃতি সভা সংগঠনের সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছাল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিতা উপন্যাস, গল্প, গদ্যলেখা মানুষের কাছে গ্রহন যোগ্য হয়ে উঠল। সাময়িক পত্র-পত্রিকা যেকোন সময়কালে গুরুত্বপূর্ন।

আদর্শ প্রশ্নমালা

১। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা কর।

২। বাংলা গদ্য বিদ্যাসাগরের হাতে সচ্ছন্দ গতি পেল - বিদ্যাসাগরের রচনা অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।

৩। গদ্য শিল্পী অক্ষয়কুমার দত্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় জ্ঞাপন কর।

৫। ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগ্রন্থগুলির পরিচয় দাও।

৬। ঔপনাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় দাও।

৭। কথাসাহিত্যিক স্বর্নকুমারীদেবীর পরিচয় প্রদান কর।

৮। বাংলা ছোটগল্পের পরিচয় প্রদান কর।

৯। বাংলা রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যশালার সম্পর্কে পরিচয় প্রদান কর।

১০। নাটক ও প্রহসন হিসাবে মধুসূদন দত্তের পরিচয় প্রদা কর।

১১। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

১২। বাংলা সাহিত্যে নাট্যকলকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় লেখ।

১৩। ত্রয়ী বন্দোপাধ্যায়ের অ্যাকৃতিত্ব আলোচনা কর।

১৪। কবি মধুসূদনের কাব্য কৃতিত্ব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখ।

১৫। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কি প্রতিভার পরিচয় দাও।

১৬। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সাময়িক পত্র পত্রিকার পরিচয় জ্ঞাপন কর।

সহায়ক গ্রন্থ

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন
- বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা - গোপাল হালদার
- বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ন ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়
- বাংলা সাহিতভ পরিচয় - দ. পার্থচট্টোপাধ্যায়
- সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় - শ্রী পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য
- ভারতের ইতিহাস - অতুলচন্দ্র রায়
- ভারতের ইতিহাস - জীবন মুখোপাধ্যায়
- বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস - স্বপন বসু
- আধুনিক ভারত - প্রনবকুমার চট্টোপাধ্যায়
- Modern India - Bipan Chandra

টিপ্পনী

তৃতীয় একক স্বাধীনতা পূর্বপর্ব

টিপ্পনী

৩.১. ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নানা কারনে বাংলায় সাহিত্য, সামাজিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটে। ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমন, পলাশির যুদ্ধ সিরাজদৌল্লার পরাজয়। ক্লাইভের চাতুর্তে বাংলার সিংহাসনের উপর ইংরেজদের প্রভুত্বের ফলে নানা পরিবর্তন দেখা দেয় । ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা, মুদ্রনযন্ত্রের আগমন, বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ইত্যাদির ফলে যেম সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দেয় তেমনি পর্তুগীজ ইংরেজ পাদরিদের আগমনে এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার, দেশীয় মানুষদের খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, হিন্দু - খ্রিষ্টান ভাব সংঘর্ষের পাশাপাশি মহর্ষি দেবেন্দ্র মাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের উ্যোগে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার ; রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবের ফলে হিন্দুধর্মের মধ্যে পুনরায় প্রাণস্পন্দনের পরিচয় লক্ষ করা যায়। রামমোহন রায়, অক্ষবকুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বাংলা গদ্য সাবলীল হয়ে ওঠে । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাঙালি জীবনে নতুন রসের সংবাদ নিয়ে আসে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রঙ্গলাল বন্দোপপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দোপাথ্যায়, নবিনচন্দ্র সেন ও আখ্যানধর্মী কাব্য বা মহাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর প্রচেষ্টায় গীতিকবিতার ধারা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, উপেন্দ্রনাথ দাস, জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখের চেষ্টায় বাংলা নাটক পরিনতির দিকে এগিয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় সমৃদ্ধি দেখা দেয়। কিন্তু বিংশ শতা্দীর প্রথমার্ধ রবীন্দ্রনাথের মত শক্তিমান লেখকের আবির্ভাবে সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারীদের আধিপত্য লক্ষনীয় ভুমিকা গ্রহন করে। রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যলগ্নেই আবির্ভাব ঘটে রবীন্দ্র বিরোধী লেখক গোষ্ঠীর। দুই ধারার পাশাপাশি অবস্থান এবং চিন্তা চেতনার সংঘাতের মধ্যদিয়ে এ যুগের বাংলা সাহিত্য পরিনতির দিকে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ মন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা - হাঙ্গামা, দেশভাগ ইত্যাদির মত নানা রাজনৈতিক ঘটনায় বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ যেমন উত্তাল হয়ে ওঠে স্বাভাবিক ভাবেই সে যুগের বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন লক্ষ করা

যায়।

টিপ্পনী

৩.২. উদ্দেশ্য

ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সাইত্য কেবল স্রষ্টার আকাস কুসুম কল্পনা নয়। সাহিত্যসৃষ্টির বীজ বোনা থাকে সমাজমাটির গভিরে। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক নানা আন্দোলনে সমাজ দেহ যেমন উত্তাল হয়ে ওঠে তেমনি তার প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পড়ে সাহিত্যের উপর। তাই সহিত্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ইতিহাসের ব্যক্ত - অব্যক্ত নানা ঘটনার ব্যঞ্জনা। তাছাড়া আধুনিক যুগের সাহিত্য কেবল প্রেম - প্রকৃতি আর অধ্যাত্ম অনুভুতির ফসল নয়। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিকঅন্বেষা থেকে, বিপ্লব বিদ্রোহ, সমাজবৈচিত্রময় প্রতিফলন বিষয় হলো বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যে প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছিল সেই যুগের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সূত্রটিকে অনুধাবন করা বৈচিত্রপূর্ন যুগটির প্রভাব সাহিত্যে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বর্তমান পাঠটি তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

৩.৩. বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক পটভূমি

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের কংগ্রস ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রধমদিকে ধনী ও উচ্চশিক্ষিত মানুষদের বার্ষিক মত বিনিময়ের সম্মত হিসেবনে তার আত্ম প্রকাশ ঘটলেও সাধারন মানুষের সঙ্গে ঐ দলের সংযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীন। তবে দ্রুত তার পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে কংগ্রেস দলের মধ্যে চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন করা যায় এবং ক্রমশই তা গনমুখী হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে কংগ্রস দেশীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরীতে বেশি সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ নিয়ে দাবী উত্থাপন করে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও আসামে পরবল ভূমিকম্প ঘটে। তাছাড়া দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ফলে বহুলোক মারা যায়। মুম্বাই অঞ্চলে প্লেগ রোগের প্রার্দুভাব দেখা দেয়। প্লেগ রোগ দমনকের নামে সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার ক্রমশ বেড়ে যায়। মহারাষ্ট্রের পুনায় এই অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। সাধারন মানুষ অত্যাচারের ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে প্লেগ কমিটির সভাপতি ব্র্যান্ড এবং তাঁর সহকারী এভারেষ্ট কে হতভা করে। এই হত্যার অপরাধে মারাঠী যুবক দারোদর চাপেকর কে প্রান দিয়ে হয়। রাজনৈতিক কারনে ফাঁসির মঞ্চে

ভারতে প্রথম শহিদ হলেন দামোদর চাপেকর। এই সময়ে মারাঠি ব্রাহমন নেতা বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রসের নেতৃত্ব গ্রহন করেন। তিনি গনপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের আয়োজন করে সেশের তরুনদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলায় সচেষ্ট হন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন মহাত্মা গান্ধী। তার আগেই তিনি দক্ষিন আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ পালিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

টিপ্পনী

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইংরেজ সরকার ভারতে শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের লর্ড কার্জন বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার ফলে ফলে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন তীব্র আকার ধারন করে। বাংলা থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অন্যান্য অঞ্চলে ও ছড়িয়ে পড়ে। মহারাষ্ট্র ও বাংলার ইংরেজ রাজশক্তির পীড়নে দেশব্যাপী সশস্ত্র আন্দোলন দেখা দেব। কংগ্রেসে আদর্শেও ফাটল ধরে। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপথ রায়, বিপিনচন্দ্রপাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতাদের প্রভাবে কংগ্রসের নরমপন্থীদের মনোভাবের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সুরাট কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী কংগ্রেসীদের মথ্যে মতভেদ ঘটে। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের মাধ্যমে ইওংরেজ রাজশক্তির উপর চরম আঘাত হানার জন্য যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা হয়। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট চালু করে ছাত্রদের আন্দোলন থেকে দুরে সরিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়ল

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে এবং ১৯১৮ খহরিষ্টাব্দের ১১ নভেম্বর হলো তার পরিসমাপ্তি। প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষ এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত না হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদি শক্তির উপনিবেশ হিসেবে ভারত সরকার মিত্রশক্তির পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। সে যুগের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ভারতের সাধারন মানুষের মনে ধারনা জন্মেছিল যুদ্ধ শেষ হলে ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দেবে। যেদ্ধের পর হিসেব করে দেখা যাব নগদ টাকা ও প্রয়োজনীয় যে সমস্ত সামগ্রী দিয়ে ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির হয়ে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরন করেন প্রায় একলক্ষ ভারতীয় সৈনিক। তাছাড়া যুদ্ধের সময় বিপ্লবীদের দমন করার জন্য ভারতরক্ষা আইন রাওলাট আইন চালু করা হয়। তার প্রতিবাদে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ থেকে পন্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মহম্মদ আলি জিন্না পদত্যাগ করেন।

টিপ্পনী

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মাচফ গান্ধিজী জানিয়ে দিয়েচিলেন রাওলাট আইন পাশ হলে তিনি সত্যাগ্রহ শুরু করবেন। মহাত্মা গান্ধি সহ প্রতিবাদী জাতীব এতাদের কথায় কর্নপাত না করে সরকার ব্যবস্থা পরিষদে আইনটি পাস করিয়ে নেয়। মহাত্মা গান্ধী ৬ই হরতাল ডেকে সত্যাগ্রহ শুরু করতে উদ্যোগী হন। সারা ভারতের মানুষ তাতে অভূতপূর্ব সাড়া দেয় ল শুরু হয় ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্যাতন। দিল্লী ও পাঞ্জাবের অমৃতসরের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় সামরিক কর্মচারী জেনারেল ডায়ারের উপরে। সরকার সুকৌশলে জনসাধারনকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এক বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতার নামে সভা ডাকায় অজস্র হিন্দু, মুসলমান, শিখ ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে জেনারেল ডায়ারে নির্দেশে শান্তিপূর্ন মানুষের উপরে গুলি চালিয়ে প্রায় একহাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। অজস্র মানুষ আহত হয়।এই ঘন্য ঘটনাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকান্ড নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে অস্যোগ আন্দোলনকে সারা ভারত জেগে ওঠে। জাতি - ধর্ম - বর্ন আ অর্থনেটিক ভেদাভেদ ভুলে সারা ভারতের মানুষকে মহাত্মা গান্ধি ঐক্যবদ্ধ করে তুললেন স্বরাজের মন্ত্রে। তিনি দেশবাসীকে জানালেন স্বরাজের জন্য চাই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যয়, সম্প্রিতী, চরকায় সুতাকাটা, অস্পৃশ্যতা বর্জন। গ্রামগঞ্জে চরকাব সুতো কাটার কাজজ চলতে লাগলো।স্বদেশী কাপড় তৈরী হলো, বিদেশী পন্য কেনা বেচে বন্ধ করার জন্য শুরুই হলো পিকেটিং। মদ-গাঁজা আফিনের মত নেশার দোকানগুলি বন্ধ করার আবেদন জানাতে শুরু করে স্বদেশী স্বেচ্চাসেবকের। চতুর্দিকে ধ্বনিত হতে থাকলে স্বাধীনতার আকুতি। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে স্বাধীনতা লাভের অধিকার সম্পর্কে ভারতবাসীরা দৃঢ় প্রতিহত হয়ে উঠলো। আন্দোলন যতই ছড়িয়ে পড়তে থাকে শুরু হয় পুলিওশি নির্যাতন। ১৪৪ ধারা জারি করে জমায়েত বন্ধ করার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেল পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। লাঠি - গুলি দিয়ে আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার প্রতিহত করতে চাইলেও তা তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। কৃষক - শ্রমিকেরাও মালিক শ্রেনির বিরুদ্ধে লড়াই করারা জন্য আসামের চা বাগানের শ্রমিকেরা মালিকের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পায়ে হেঁটে চলে এলো চাঁদপুর পর্যন্ত ল চাঁদপুরে পুলিশ শ্রমিকদের উপর গুলি চালানমোর প্রতিবাদে স্টিমার ও আসাম - বেঙ্গল রেলপথে হলে ধর্মঘট। পাঞ্জাবের নানাকানা মাঠের রোহান্তের বিরুদ্ধে শিখ স্প্রদায়ের সতভাগ্রহ আন্দোলন শুরু হলো ল এই সময়ের অন্যতম আর একটি ঘটনা

মোপালা বিদ্রোহ। মোপালারা মালাবার উপকূলের গরিব মুসলমান অধিবাসী জমিদার মহাজন ও সরকারের শোষনের বিরুদ্ধে তারাআন্দোলনে সামিল হলো। খিলাফৎ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত মোপালা বিদ্রোহীরা স্বল্প কালের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুললেও শাসক শক্তির তীব্র আঘাতে তা ভেঙে পড়ল এবং বহুলোকবন্দী হলো, মারা গেল, ১০০জন বিদ্রোহীকে মালগাড়ির কামরায় ভরে কালিকট থেকে মাদ্রাজে চালান করে দেওয়া হলো।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ভারতবষফের শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে সাইমন কমিশন গঠন করে। ইংল্যান্ডে তিনবার গোলটেবিল বৈঠকের পরও তা কোনো কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সুকৌশলে দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ নয়। বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হল।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের পূর্ব থেকে আন্তজার্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার ফলে বাঙালির মন থেকে স্বাদেশিকতার মোহ ঘুচাতে থাকে। নবজ্রাগত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে অনেকে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী ও মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। রুশ বিপ্লবের সাফল্য (১৯১৭) প্রথম কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশানল (১৯১৯) লেনিনের প্রস্তাবিত কলোনিয়াল থিসিসের সর্বাত্মক স্বিকৃতি (১৯২০)। ভারত কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৫) ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে পালাবদলের সৃষ্টি করে। গান্ধিবাদি দর্শনের পাশাপাশি দেখা গেল মার্কসবাদী লেনিনবাদের প্রতি আকর্ষন। গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদদের মধ্যপন্থা গ্রহন করলো সমাজবাদ। গড়ে উঠল কংগ্রস সমাজতন্ত্রী দল (১৯৩৪)। ১৯২৬ সালে হিন্দু - মুসলমানদের ভেদাভেদ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠায় প্রতিষ্ঠিত হলো মুসলিম লীগ।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মলাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেই অধিবেশনে পূর্ন স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৩১ শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে কংগ্রেস সভাপতি জাতীয় পতাকা উততোলন করলেন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারী পালিত হল প্রথম স্বাধীনত দিবস। পূর্ন স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহিত হজওয়ার পর গান্ধিজীর উপর আন্দোলনের ভার দিলেন কংগ্রস নেতৃবর্গ। গান্ধিজী প্রথমে আপোসের চেষ্টা শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মার্চ গান্ধিজী সবরমতী আশ্রম থেকে মাত্র উনিশজন সঙ্গী নিয়ে ডান্ডীর দিকে যাত্রা শুরু করেন। ব্রিটিশ শাসকদের সশস্ত্র বাধা অতিক্রম করে অহিংসার মন্ত্র নিয়ে গান্ধী লবন আন্দোলন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সংগঠিত করে দেশ - বিদেশ থেকে লাভ করলেন অভুতপূর্ব জন সমর্থন।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য চট্টগ্রাম গড়ে উঠলো ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনী। সে বছর ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে সশস্ত্র বিপ্লবীরা সরকারী অস্ত্রাগার দখল করে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করেন। অস্ত্রাগারটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। টেলিফোন লাইন ও রেলপথ বিচছিন্ন কে আষ্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে রিজার্ভ পুলিশের ছাইনিতে প্রতিলিত হল অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার। সশস্ত্র আন্দোলন ও বিপ্লবীদের কর্মকান্ডের ধারায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন হয়ে থাকলেও ইতহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের শেষে জইংল্লেন্ড আবার বসলো গোলটেবিল বৈঠক। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। মদনমোহন মালব্য ও সরোজিনী নাইডুও ছিলেন প্রতিনিধি দলের সদস্য। ইংরেজরা কৌশলে স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ভেস্তে দেওয়ায় মহাত্মাজী হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। ইংরেজ সরকার একদিকে শান্তির জন্য গোলটেবিল বৈঠক আসলে গন আন্দোলন দমনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ১৬ই সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলি চালনায় হিজলী জেলে দুজন রাজবন্দীর মৃত্যু ঘটে।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ইংরেজ সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির ফলে পৃথক নির্বাস নীতি অনুযায়ী ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন চালু করা হল ল ১৯৩৬ - ৩৭ খ্রিষ্টাব্দের নির্মানে বাংলা ও পাঞ্জাব ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের জাপানের মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চিন দখল, মুসোলিনীর নেতত্বে ইতালির আবিসিনিয়া দখল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি সম্পর্কে উদাসিনতা এবং জার্মানীর একতান্ত্রিক নায়ক হিটলারের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে তখনকার ভারতের বড়লাট লিনলিথগো যুদ্ধরত দেশ হিসেবে ভারতের ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষনার কথা ঘোষনা করেন। হরিপুরা কংগ্রসের অধিবেশনে আগেই কংগ্রস নেতারা প্রস্তাব গ্রহন করেছিলেন, যুদ্ধ হলে ভারত তাতে যোগ দেবেনা। তাই সরকারের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে কংগ্রস নেতারা মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ব্যাপকভাবে যুদ্ধ বেধে যাওয়াব ফ্রান্স জার্মানীর দখলে চলে যায়। ইংল্যান্ডের উপর শুরু

হয় চরম বোমা বর্ষন। কংগ্রেসের নেতারা আইন অমান্য আন্দোলন করে কারারুদ্ধ হণ। যুদ্ধের সুযোগে ব্রিটিশসরকারকে চাপ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা তাঁদের লক্ষ ছিল ল ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর কংগ্রসের নেতারা মুক্তি পান।

১৯৪১ ক্রিসটাব্দের ২২ শে জুন হিটলার সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমন করে। যুদ্ধ এতদিন ইউরোপীয় মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও জাপান যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে ভারতের বিপদের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মদেশ, মালয় থেকে জাপানীরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতন ঘটে। ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতে আসা উদ্বাস্তুর মুখ থেকে জানা যাব ইংরেজদের শোচনীয় অবস্থার কথা। ইংরেজ পরাজিত হয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য গ্রামবাংলার কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে তৈরী করে সেনা ছাউনি। সেনাবাহিনীর জন্য ভারত থেকে সেনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে গ্রামবাসীদের সাইকেল । নৌকা ইত্যাদি কেড়ে নেওয়া হয় । যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংরেজ সরকার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সংগ্রহ করায় দেশের মানুষের খাদ্যে টান পড়ে। সরকার কন্টোলে অত্যাবশকীয় ভোগ্যপন্য জনসাধারনের মধ্যে সুলভে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও কালোবাজারিদের চক্রান্তে তা সাধারন মানুষের হাতে এসে পৌঁছায় না। দেখা দেয় দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ। পূর্ন স্বাধীনতা না পেলে কংগ্রেস যুদ্ধে সাহায্য করতে অস্বীকার করে । মুসলীম লিগে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রেনের অধিকারের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবীতে অনড় থাকে এবং ইংরেজদের সমর্থন করতে অস্বীকার করে। মুসলীম লীগের পাকিস্তানের দাবী তীব্র হয়ে ওঠায় অবিভক্ত বাংলায় প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট লীগ Direct Actionএর কর্মসূচী গ্রহন করার দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় । ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদে স্বাধীনতার দাবী মেনে নেয় - কিন্তু সে স্বাধীনতা অনন্ত ভারতের নয়। ভারত ও পাকিস্তান দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্মের ফলে ভারত স্বাধীনত লাভ করে। কিন্তু তার আগে আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যায়।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসে পৌঁছায়। তিন সদস্য এই দলে ছিলেন লর্ড গেথিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস, এ.ডি. আলেকজান্ডার। তাঁরা ভারতে এসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বিশেষভাবে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেন হিন্দু ও মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেন হিন্দু ও মুসলমানদের প্রবর্তন ও

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ফেড়ারেশন গভর্নমেন্ট তৈরি করা হবে। আপাতত কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নেতারা তারা মেনে নিলেও লীগের নেতৃবৃন্দের মনে একটা সংশয় ছিল। তার মূল কারন ছিল স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তা। তাই ক্যাবিনেট মিশন চলে যাওয়ার পরে মুসলীম লীগ Direct Action এর পপথ বেছে নেওয়ায় অবিভক্ত ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়ঙ্কর আকার ধারন করে। দেশভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর দেশভাগের রূপরেখা প্রস্তুতের ভার দেওয়া হয়েছিল ইংলন্ড থেকে আগত বিশিষ্ট আইনজীবি সিরিল রোয়েদাদের উপর। তাই দেশভাগের মানচিত্রের সঙ্গে তার নাম যুক্ত করে সেই চুক্তিকে বলা হয় র‍্যাডক্লিফ-নিয়েদাদ।ভারত ভাগের আগে নেকতাজি সুভাষচন্দ্রের আত্মগোপন। বিদেশে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা । সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তিনি ভারতকে স্বাধীনতার লক্ষে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ১৯৪৬ এর নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি নানা ঘটনার অভিঘাতে জর্জরিত ভারতীয় জনজীবনে দেশভাগের দুঃখ ও বেদনা নিয়ে স্বাধীনতা এসে উপস্থিত হলো।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অবিভক্ত বাংলায় রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৯০১) । যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন (১৯০৬) । যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বাংলা বিভাগেরবীন্দ্রনাথের ডাইরেক্টর পদ গ্রহন (১৯০৬ -০৮), রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ (১৯১৩), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা (১৯১৬) ও রবীন্দ্রনাথের তিরোধান (১৯৪১) এ যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ্য মাইলস্টোন হলো, শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প প্রকাশ (১৯০৩), সবুজপত্র, নারায়ন ও ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রকাশ (১৯১৪), রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ প্রলাপ (১৯১৪), শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ও প্রমথচৌধুরীর ধীরচলের হালখাতা গ্রন্থের আত্প্রকাশ (১৯১৭) কাজী নজরুল ইসলামের ধূমকেতু পত্রিকা, অগ্নিবীনা কাব্যগ্রন্থ ও মোহিতলাল মজুমদারের স্বপনপশারী কাব্যগ্রন্থের আর্বিভাব (১৯২২) কল্লোল পত্রিকা ও সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল (১৯২৩) প্রকাশ। ক্রান্বয়ে বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত , মানিক বন্দোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ রবীন্দ্র সমসাময়িক ও রবীন্দ্রত্তোর উপন্যাসিক ও কবিদের আত্মপ্রকাশ। যাঁদের অবদানে সমকালীন বাংললা সাহিত্য পরিস্ফুট হয়ে নতুন

পথের সন্ধান দিল।

টিপ্পনী

৩.৪. বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা

(ক) নাট্যজগৎ

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের বিনোদনের জন্য ইউরোপীয় ধাঁচের রঙ্গমঞ্চে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। তার ফলে প্লে হাইস, চন্দন নগর থিয়েটার, খিদিরপুর থিয়েটার, দমদম থিয়েটার ইত্যাদি গড়ে ওঠে। তার প্রভাবে ইউরোপীয় আদর্শ অউযায়ী বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য রুশ পর্যটক হেরাসিম লেবেডফ বেঙ্গলী থিয়েটার স্থাপন করেন। লেবেডফের আট্যশালা বন্ধ হবে যাওয়ার পর দেশীয় জমিদারের উদ্যোগে বাগানবাড়ী বা প্রাসাদে নাট্যাভিনয়ের প্রবণতা লক্ষ করা যাব। লেবেফের পর বেশকিছু দিন বাংলা নাটক বন্ধ থাকার পর জমিদার প্রসন্ন কুমার ঠাকুর হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর শ্যামাপদার নবীনচন্দ্র বসুর সখের থিয়েটার আশুতোষ দেব (ছাতুআবু)র থিয়েটার পাথুরির্য়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় জোড়াসাঁকো থিয়েটার ইত্যাদি গড়ে ওঠে। তারপর গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবর্ভাবের ফলে বাংলায় জাতীয় নাট্যশালার প্রবর্তন ঘটে।

বাংলা নাটকের আদিযুগ তারাচরন, যোগেন্দ্র চন্দ্রগুপ্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ন তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু, উপেন্দ্রনাথ দাস, জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরানিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদি রচনা করে রঙ্গমঞ্চকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। এই ধারাব নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক অভিয় শিক্ষক ও অসাধরন সংগঠক হিসেবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। অমৃতলাল বসু, দবিজেন্দ্রলাল রায়, কঈরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিওদ প্রমুখ নাট্যকারদেদর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীতেই নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ঐতিহাসিক রচনা করে বাংলায় জাতীয়তাবাদী দষ্টিভঙ্গিকে সুদৃঢ় করে তোলেন। বিংশ শতাব্দীর এই জাতীয় নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মীরকাশির (১৯০৪), অলোক (১৯০৫), সিরাজদৌল্লা (১৯০৬) ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭) চন্দ্রগুপ্ত (১৯১২) প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য

টিপ্পনী

উনবিংশ শতাব্দী আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর্বিভাব ইত্যাদি কারনে হিন্দুত্বের জাগরন ঘটে। গৌরিশ যুগের পৌরানিক ভক্তিমূলক নাটকের সাহায্যে বঙ্গরঙ্গে ভক্তিরসের যে প্লাবন লক্ষ করা যায় তার সঙ্গে মিশে ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পৌরানিক নাটক পাপানী (১৯০০), সিতা (১৯০৮), ভীষ্ম (১৯১০) নাটকে অলৌককতা ও অতিরিক্ত ভক্তিরসে প্রাধা্যকে বাদ দিয়ে পৌরানিক নাটকগুলিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদি দষ্টিভঙ্গি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে প্রতীকধর্মী তত্ত্ব নাটকের আবিভাব ঘটে। কবি ও নাট্যকার ইয়েটস্, মেটারলিঙ্ক, হপ্টম্যান, স্ট্রিন্ডবার্গ প্রমুখের প্রাবে রীন্দ্রনাথ এই ধরনের নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেও তিনি পুরোপুরি পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরন করেননি। উপনিষদের আদর্শে বিশ্বাসী লীনাবাদ - আনন্দবাদের উপাসক রবীন্দ্রনাথ রূপক সাংকেতিক নাটক রচনা করতে গিয়ে ভারতীয় আধ্যাত্ম বোধ ও ভারতীয় কাব্য সাহিত্যের মূল প্রবণতাগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকে অরূপ ও অসীমের কথা একটা ভূমিকা গ্রহন করেছে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক - সাংকতিক শ্রেনীর নাটকগুলিকে বিশহলেষন করলে দেখা যায় তার মধ্যে সিমা - অসীম রূপ -অরূপের দ্বন্দ্ব, প্রানশক্তির সঙ্গে জড়শক্তির সংঘাত ও রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনের কথাও বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যারফলে রবীন্দ্রনাথের রূপক-প্রতীক সাংকেতিক শ্রেনীর নাটকগুলি সার্থকতা মন্ডিত হয়ে উঠেছে।

এ যুগের অন্যান্য নাট্যকার হিসেবে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

(খ) সাময়িক পত্র

বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সাময়িক পত্র পত্রিকার গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে। বাংলা গদ্যগঠন ও চিন্তাশীল যুক্তিনিওষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাময়িক পত্রের অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের হিকি সাহেবের বেঙ্গল গেজেট কলকাতা ইংরেজীভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রথম ভারতীয়

সংবাদপ্ত। তারপর শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে দিগদর্শন ও সমাচারচন্দ্রিকা নামে দুটি পতইকা প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বাউলগেজেট, রামমোহন রায়ের সম্পাদনায় সমাচার চন্দ্রিকা, রামমোহন ও ভাবনী বন্দোপাধ্যায়ের সংবাদ কৌমুদী, ভবানীচরন বন্দোপাধ্যায়ের একক সম্পাদনায় সমাচার চন্দ্রিকা।

টিপ্পনী

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র প্রকাশিত হয় । রবীন্দ্রনথের আশীর্বাদ নিয়ে শুধু সবুজপত্র প্রকাশিত হয়নি । অন্নদাশঙ্কর রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্তম ধূর্মটীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারিত কৃষ্ণদেব, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সে যুগের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকরা সবুজপত্রকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহন করেছিলেন। সবুজ পত্রের সমসাময়িক কালে বাংলায় যে সমকস্ত উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে রামনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত প্রবাসিম দবিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষ, চিত্তরঞ্জন দাশের নারায়ন ইত্যাদির নাম সুপরিচেত। এই পত্রিকা গুলিকে কেন্দ্র করে সে যুগে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েচিলেন তাদের মধ্যে প্রধান হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রমুখ লেখকেরা।

(গ) কথাসাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা কথাসাহিত্যের যাত্রাপথ সূচিত হয়েছিল প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির আধ্যমে । বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া সে যুগে বঙ্কিমীরীতির ঐতিহাসিক রোমান্স ও সামাজিক - পারিবারিক উপন্যাস রচনায় বিশেষভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার । বঙ্কিমচন্দরের ঐতিহাসিক রোমান্সের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনার দিকে বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষী রচনা করেছিলেন। সামজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের বিধবাবিবাহ সমস্যা নিয়ে চোখের বালি উপন্যাস রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ উপন্যাসে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষনরীতি গ্রহন করেচিলেন রবীন্দ্রনাথের ওখের বালিউ কে বাংলা সাহিত্যর প্রথম সার্থক শিল্পসম্মত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা চলে।

গোরা রবীন্দ্রনাথের এপিকধর্মী উপন্যাস। হিন্দু-ব্রাহ্ম ধর্মের ভাবসঘর্ষ, স্বদেশী

টিপ্পনী

আন্দোলন, ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের তোষন পীড়নের, উভয়বিধ সম্পর্কের পটথভূমিকে গোরার জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে রিত উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথ গোরা-বিনয়-সুচরিতা - ললিতার প্রেম কাহিনীর পাশাপাশি আনন্দময়ীর মাতৃত্ব ও পরেশবাবুর চরিত্রের উদাআরতার সাআয্যে বিশ্ববোধের পরিচব স্পষ্ট করে তুলেছেন । গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেমন সামাজিক সংকটের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি ঘরে-বাইরে ও চার অধ্যায় উপন্যাসে সে যুগের দ্বন্দ্বময় রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিচয়টি তুলে ধরেচেন। ঘরে বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশের অহিংশ স্বদেশী আন্দোলন ও সন্দীপের সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারার মধ্যে নিখিলেশের স্ত্রী বিমলার হঠাৎ আগমন ও নিখিলেশ বিমলারা দাম্পত্য জীবনের বিষাদ করুন পরিনত ফুটিয়ে তোলা হয়েচে। চার অধ্যায় উপন্যাসে পএম ও বিপ্লবের সংঘাতে অতিন ও এলার জীবে কীভাবে ত্রাজিক পরিনতি মিশে আসে তা দেকানো হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পের প্রথম নির্মাতা রবীন্দ্রনাথ । প্রথমে তিনি ঘাটের কথা, রাজপথের কথা নামক দুটি গল্প রচনা করেন। অবশ্য তার আগে কৌশরে তিনি ভিখারিনী গল্পটি লিখেছিলেন। রবীন্দ্র রচিত গল্পগুলিকে তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করা যায়-

(১) প্রথমপর্ব- হিতবাদি সাধনা পত্রিকার যুগ

(২) দ্বিতিয়পর্ব- ভারতী- সবুজপত্রের যুগ

(৩) তৃতীয়পর্ব- তিনসঙ্গীর যুগ

বিংশ শতাবদীর প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক হিসেবে শরৎচন্দ্রের আর্বিভাব ঘটেছিল। শরৎচন্দ্র পারিবারিক - সমাজিক, রোমান্টিক প্রেম, সমাজ-বিগিত প্রেম, তত্ত্বপ্রধান বুদ্ধিবাদী ইত্যাদি নানা শ্রেনীর উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বিষয়ভিত্তিক শ্রেনীবিন্যাসের মধ্য দিয়ৈ শরৎচন্দ্রের উপবন্যাসগুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

পারিবারিক - পন্ডিতমশাই, বৈকুন্ঠের উইল

সমাজসমালোচনা - পল্লীসমাজ, দত্তা, অরক্ষনীয়, বামুনের মেয়ে।

সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম - বড়দিদি, চন্দ্রনাধ, চরিত্রহীন, গৃহদাহ।

রোমান্টিক প্রেম - দত্তা, দেনা পাওনা।

রাজনৈতিক ও তত্ত্বপ্রধান - পথের দাবী, শেষপ্রশ্ন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ যুগে ছোটগল্পকার হিসেবে খ্যাতিমান হলেও উপন্যাস সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাসের নাম রমাসুন্দরী পরবর্তীকালে তিনি নবীন সন্ন্যাসী, রত্নদীপ, সিন্দুর কৌটা, জীবনের মূল্য, মনের মানুষ, আরতি, সত্যবালা, গরীব স্বামী ইত্যাদি নানা উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

প্রভাত কুমারে খ্যাতি হলে ছোটোগল্প রচনার জন্য। রবীন্দ্রনাথ প্রভাত কুমারের ছোটগল্পের প্রশংসা করে জানিয়েছিলেন 'তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও কিছুমাত্র ভার আছে আ বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।' প্রভাত কুমার নিজজেই সবীকার করেছেন তাঁর বিখ্যাত দেবী গল্পের প্লটটি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

প্রভাত কুমারের গল্পগুলি নির্মল হাস্যরসের সঙ্গে পুরাতন যুগের নিদ্বন্দ্ব বাঙালি জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ছোটগল্প গুলি স্কেচধর্মী হলেও তার মথভে চলমান জীবনের ছবি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। বিদেশী পটভূমিতে লেখাগুলিতা তাঁর ব্যাক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্তদৃষ্টির সংমিশ্রন ঘটেছে।

জগদীশ গুপ্তের গল্প উপন্যাস যথেষ্ট স্বাতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনস্তাস্তিকতা ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে তাঁর রচনাগুলিকে মোলিক ও স্বাতন্ত্র্য ধর্মী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। লঘুগুরু ও অসাধু সিদ্ধার্থ তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস হলেও তিনি স্বল্প আয়তনের অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস গুলিকে নানা শ্রেনীতে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন -

১. নারী পুরুষদের সম্পর্ক - লঘুগুরু, গতিহারা জাহ্নবী, নিষেধের পটভূমিকায় এই জাতীয় উপন্যাস।

২. পল্লীসমাজ কেন্দ্রিক - যথাক্রমে, রোমন্থন, দুলালের দোলা।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৩. নিয়তিবাদ - রতি ও বিরতি, অসাধুচিদ্ধার্থ।

জগদীশ গুপ্ত মফস্বলে বাস করতেন। তাই তাঁর রচনায় পল্লীজীবন চিত্রের পাশাপাশি। গ্রাম সংস্কার ও নিয়তি বাদকে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ বিজতানবাদী দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষন করতে চেয়েছেন। হতাশা, নৈরাশ্য ও মৃত্যু চেতনা জগদীশগুপ্তেররচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা দিয়েছে।

বিনোদিনী জগদীশ গুপ্তের প্রথম গল্প সংকলন। তারপর শ্রীমতী ভৃঙ্গার, অজ্ঞানশলাকা, উদয় লিখা, উপায়ন, জগদীশ গুপ্তের স্বনির্বাচিত গল্প ইতাদি প্রকাশিত হয়। তিনি তার গল্পে বাস্তবদৃষ্টিতে মানুএর নিবারন সত্যরূপটিকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি প্রথাগত সংস্কারকে যেমন ডাউতে চেয়েছিলেন তেমনি মানুষের নীচতা, বর্বরতা ও ভন্ডামির প্রতিও তিনি খড্গাহস্ত ছিলেন। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের নানা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় জগদীশ গুপ্তের কথা সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে।

রবীন্দ্রত্তর যুগের কথাসাহিত্যের ধারায় তিনজন প্রধান শক্তিমান লেকক ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভুষন বন্দোপাধ্যায় ও মানিক বন্দোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর দীর্ঘজীবনে ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যেমন দেখেছেন তেমনি সেই ঘটনাগুলি থেকে তিনি যেভাবে তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎকে সমৃদ্ধ করে তুলেচেন তা অত্যন্ত প্রশংসীয় ল দুই বিশ্বযুদ্ধ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন, সশস্ত্র আন্দোলন।

তারাশঙ্কর উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার দুই ধারাতেই সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর উপ্যাসগুলিকে প্রধানত তিনপর্বে বিভক্ত করা যায়। যেমন -

১. প্রথম (উন্মেষ) পর্ব - চৈতালী ঘূর্নি, পাষানপুরী, নীলকণ্ঠ, রাইকমল, আগুন।

২. দ্বিতীয় পর্ব - ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, কবি, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, সন্দীপন পাঠশালা,

৩. তৃতীয় (আধুনিক পর্ব) - উপকথা, বিচারক, রাধা, সপ্তপদী, মহাশ্বেতা।

তারাশঙ্কর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প সংকলনের নাম ছলনাময়ী, জলসাঘর, রসকলি, বেদেনী, যাদুকর ইত্যাদি। এই গ্রন্থগুলিতে তারাশঙ্করের লেখা গল্পে গ্রামবাংল; আর বৈষ্ণবীয় রসাশ্রিত জীবন যাত্রার পরিচয় রয়েছে।

টিপ্পনী

বাংলা কথা সহিত্যের এক বিশেষ মূহূর্তে কথাশিল্পী রূপে বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের আবর্ভাব। কল্লোলের বাস্তবতা ও দেহচেতনায় আবিল সাহিত্য যকন বাঙ্গালি পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে এমন সময় বাঙালী জীবনের সহজ সরল রূপ নিয়ে বিভূতিই ভঠষন পথের পাঁচালী উপন্যাস রচনা করে পাঠকদের চমকে দিয়েছিলেন। পান্ডিত্যপূর্ণ মননধর্মী রচনা নয়, অতি রোমান্টিকতায় তরল ভাবোচ্ছাস ও বিভূতিভুষন লেখায় লক্ষ করা যায় না সহজ সরল অনাড়ম্বর রহস্য এবং মানব হৃদয়ের অবিনশ্বর অনুভূতি ছিল বিভূতিভুষনের রানার প্রধান বিষব সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও রহস্যকে তিনি যেন তাঁর রচনায় উনমীলিত করে তুলতে পেরেছেন । বিভূতিভূষনের লেখা ছোটগল্পের সংকলনগুলির মধ্যে মেঘমল্লার, মৌরীফুল, যাত্রাবদল ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দোপাধ্যায় রচনারীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্য সে যুগে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিলেন। রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে মানিক বন্দোপাধ্যায় মানুষের জীবনকে দেখতে চেয়েছেন বস্তিনিষ্ট দৃষ্টিতে। ফ্রয়েড়ীয় আলোকে তিনি মান মনের গভীরতর রহস্যগুলিকে উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। জনকী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, অহিংসা, অমৃতস্য পুত্র, সহরতলী, সতুস্কোন ইতভাদি উপন্যাসে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও মৌলিকতা পরিচয় পাওয়া যায়। আতসীবাসী, সরীসৃপ, মিহি ও মোটা কাহিনী, ভেজাল ইত্যাদি মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ।

ডা. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বনফুল ছদ্মনামে উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেচিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে এবং তিনি খ্যাতি অর্জন ও করেছিলেন ল তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস তৃণখন্ড ও গল্পগ্রন্থ বৈতরনীতীরে রচনা করে বাংলা কথা সাহিত্যের ধারায় নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান উপন্যাস গুলির নাম মৃগয়া, ডানা, দ্বেরথ ইত্যাদি। স্বাধীনোত্তর পর্বেও তিনি অজস্র উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল - বৈতরনীর তিরে, বনফুলের গল্প, বনফুলের আরো গল্প, বাহুল্য, বিন্দু বিসর্গ ইত্যাদি । বাস্তবজীবনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সরস হাস্যরসের সংমিশ্রনে বনফুলের কথা সাহিত্য বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়ে উঠেছে।

টিপ্পনী

(ঘ) কাব্য - কবিতা

রবীন্দ্র পূর্ব যুগে বিহারীলাল গীতিকাব্য ধারার সূত্রপাত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কাব্যগুরু ও ভোরের পাখি নামে অভিহিত করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের উন্মেষ ঘটে। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ সান্ধ্য সঙ্গীত, প্রভতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসি, সোনারতরী চিত্রা, চৌতালী ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেচিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রবীন্দ্র রচিত কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচিন ভারতের মহৎ জীনাদর্শ থেকে ভারতের শাশ্বত মহিমার কথা রবীন্দ্রনাথ কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষনিকা, নৈবেদ্য, স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ, নানা কবিতায় উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধধর্ম ও অহিংসার বার্তাও এ যুগের রবীন্দ্র কবিতায় দেখা গিয়েছে।

রবীন্দ্র কবিতার জনপ্রিয়তার ঘুনো রবীন্দ্রনাথের বলাকা পূর্ব যুগে রচিত কাব্যগ্রন্থের ভাবভাষ, শব্দ-ছন্দ অবলম্বনে কবিতা রচনা করে যে কবিশৌধী গড়ে উঠেছিল তাঁরা রবীন্দ্রানুসারী কবি বলে পরিচিত। এই শ্রেনীর কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগচি, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুনানিধান বন্দোপাধ্যায় নাম সুপরিচিত। যতিন্দ্রমোহন বাগচি সংকলিত হয়েছিল কুন্দ, কিশলয়, পর্ণকুঠ, একতারা, বনমল্লিকা নুপুর, অজয় কাব্য গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি অট্ট শ্রদ্ধা পোষন করও প্রমথ চৌধুরী, সতভেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিরা স্বতন্ত্র পথের সন্ধান করেচিলেন। প্রমথ চৌধুরী সনেট রচনায় অসাধরন পারদরর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একাধারে অমর অনুবাদক আর অন্যদিকে ছিলেন ছন্দএর যাদুকর। ঐতিহাসিক পৌরাণিক বিষয় থেকে সমসাময়িক যুগের ঘটনা থেকে উপকরন সংগ্রহ করে তিনি যে সমস্ত কবিতা রচনা করেন তার মধ্যে সমাজ সচেতনতা, মানবতাবোধ, সহানুভূতি ও সমবেদনার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বতেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম - সবিতা, বেনু ও বীনা, সন্ধিক্ষন, হোমশিখা, ফুলের ফসল, অভ্র-আবীর, বিদায় আরতি ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র যুগের অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম নবিশেষভাবে উল্লেখযোগভ।

রবীন্দ্রানুসারে কবিদের প্রায় সকলেই গ্রামে বা মফস্বলে শহরে বসবাস

করতেন। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, মাতারিক জীবনে যন্ত্রনা ও পুরাতন মূল্যবোধের ডাউন সম্পর্কে তাঁরা সঠিক ধারনা অর্জন করতে পারেননি। সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে কবিদৃষ্টির বদল বাংলা কবিতার ্ষেত্রে রীন্দ্র যুগে ধরা পড়ল মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজি নজরুল ইসলামের কবিতাব ল রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক প্রেমের জগৎ ধেকে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে মোহিতলাল দেহবাদ ওও ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করলেন। ইন্দ্রিয়াত্মক প্রেমের কবিতা রচনায় মোহিতলাল মজুমদার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে লিখলেন স্বপন পসারী, সমর গরল।

পেশায় বাস্তকার বিজতানদৃষ্টির অধিকারী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও সুখবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধীতা করে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে মাউষকে আকৃষ্ট করার মায়াজাল বলে উপলব্ধি করলেন। মানুষের জীবনের আপাতত সুখের আড়ালে তিনি দুঃখের গভীরতা ও নাস্তিক্যবোধের পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রযুগে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলির নাম - মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, ইত্যাদি।

যুদ্ধ ফেরৎ দুৎখ ও দারিদ্র্যের জীবনের করুন ও মর্মদর্শী দিকটিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক দিকদিয়ে মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি ছাড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিন্দু - মুসলমান - জৈন - বৌদ্ধ - খ্রিস্টানের মধ্যে ঘৃনার মনোভাব সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে নজরুল তীব্র বিদ্রোহ ঘোষননা করায় বিদরোহী কবি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে ব্যাথার দান, অগ্নিবীনা,. ছায়ানট, দোলনচাঁপা, বিষের বাঁশি, ফনিমনসা, সর্বহারা, বুলবুল, সন্ধ্যা, নূতন চাঁদ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কবিতা আধুনিকতার চিহ্ন নিয়েউপস্থিত হলেন জীবনান্দ দাশ, সুধীনন্দ্র দত্ত, অমিয় চক্রবর্ত্তী, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবি। জীবনান্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরাপালক এ তেমন কোনো মৌলিক কণ্ঠসর পরিচয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র সমসাময়িক সতভেন্দ্রনাথ, মোইললাল, নজরুল সহ রবিন্দ্রোত্তর নানা কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় কাব্যটিতে থাকলেও শেষপর্যন্ত জীবনান্দ এই কাব্যগ্রন্থ থেকে নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মানে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

প্রগতি ও কবিতা পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আন্দোলনের অন্যতম ব্যাক্তিত্ব। তাঁর প্রথম বাংলা কাবভগ্রন্থ মর্মবানী তে রবীন্দ্র - সত্যন্দ্র - নজরুলের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও দ্রুত তিনি তা অতিক্রম করে স্বকীয়তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। প্রেমের দেহাতীত রূপ নয়, দেহের মধ্যেই তিনি প্রেমের অস্তিত্বের কথা ঘোষনা করলেন বন্দীর বন্দনা কাব্যগ্রন্থে। কঙ্কাবতী, দময়ন্তী, দ্রৌপদীর শাড়ি, শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর, মরচে পড়া পেরেকের গান ইত্যাদি তাঁর বহু আলোচিত কাব্যগ্রন্থ।

কল্লোল গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোনীয় হয়ে ওঠেননি। বাস্তবতার নামে প্রকৃতি পরবশ্যতা তাঁর কবিতায় প্রাধান্য লাভ করেনি। তিনি সমাজতান্ত্রিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শ্রমজীবী শ্রেনীর মানুষের প্রতি জানিবেছে আত্মিক সমর্থন। প্রথমা স্রাট, ফেরারী ফৌজ, সাগর থেকে ফেরা, কখনও মেঘ, হরিণ-চিতা-চিল, অথবা কিন্নর ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগভ কাব্যগ্রন্থ।

ইংরেজী সইত্যে সুপন্ডিত বুদ্ধিপদী কবি বিষ্ণু দে এলিয়টকে যেমন অনুকরন করেছেন তেমনি রবীন্দ্র ব্যবহৃত শব্দ, রবীন্দ্রসুবাসিত পংক্তি চয়নে তিনি রবীন্দ্রভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। শুষ্ক অণুর্বর সময় ও সমাজের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মানুষের নির্লিপ্ত স্বভাবকে তিনি বিদ্রুপ করেচেন। তাঁর কবিতাব সমাজ পরিবর্তনেদর আহ্বানও ধ্বনিত হয়েচে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ - উর্বশী, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার, তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাক, উত্তরে থাকো মৌন, আমার হৃদয়ে বাঁচো ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনায় পরিপূর্ন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, চিন-জাপানের যুদ্ধ আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে আলোড়িত করে তোলে। গান্ধিজীর ভারতছাড়ো আন্দোলন, নৌ বিদ্রোহ, ডাক-তার বিদ্রোহ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে দেশ বিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা এই দশকের জাতীয় জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই দশকের অন্যতম প্রধান কবি হলের সমর সেন। হতাশা ও নৈরাশ্যের পরিবেশে মার্কসবাদি দৃষ্টিতে ঠশ্রেনীবিভক্ত সমাজে শোষক শোষিতের দ্বন্দের মধ্য দিয়ে শ্রমিক - কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মানুষের উত্তরনের আকাঙ্খাটা সমর সেনের কবিতায় আভাসিত হয়েছে।

মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের অনুসারি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতায়

সংগ্রামী চেতনাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থগুলির নাম - পদাতিক, অগ্নিকোন, চিরকূট, ফুলফুটুক, একটু পা চালিয়ে ভাই ইত্যাদি। মৌলিক কিতার পাশাপাশি তিনি নানা ভাষার নানা কবির কিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। টাঁর অনূদিত কাব্য সংকলনগুলির নাম - নাজিন হিকমতের কবিতা, পাবলো নেরুদার কবিতা, হাফিজের কবিতা। বিষয়বস্তুকে শিল্প সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

মার্কসবাদী কবিতার ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য। অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন থেকে তিনি দলের সক্রিয় সদস্যপদ গ্রহন করেছিলেন। বিদ্রোহ বিপ্লব, শোসন ও মুক্তি তাঁর কবিতায় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের রূপরেখার পরিচয় পাওয়া যায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ গুলির নাম - ছাড়পত্র, ঘুমনেই, পূর্বাভাষ, মিঠেকড়া ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসারি কবি, রবীন্দ্র বিরোধি কবি, ত্রিশের দশকের পাশ্চাত্য আধুনিক কবিতার প্রভাব জাত আধুনিক কবিদের কবিতা চল্লিশের দশকে মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার আলোকে কবিতাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গী করে তোলার প্রয়াসের মধ্যে এই যুগের কবিতার একটি পরিণত রূপ লক্ষ করা যাব ল পঞ্চাশের দশক অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে আবার বাংলা কবিতার নতুন বাঁক বা পালাবদল ঘটতে থাকে।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমির সঙ্গে ঐ যুগে রচিত সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন।

২। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছিল নাটকারদের পরিচয় সহ তা উল্লেখ করুক।

৩। মন্মথ রায়ের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকজন প্রাবন্ধিক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। প্রাবন্ধিক ও কবি হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর মূল্যায়ন করো।

৬। ছোটগল্পের রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৭। কথা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের ভূমিকা বিশ্লেষন করো।

৮। রবীন্দ্রানুসারী কবি কবিদের পরিচব দাও।

৯। বাংলা সইত্যে সবুজ পত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করো।

১০। কবি সত্যন্দ্রনাথ দত্তের কবি প্রতিভার পরিচয় দাও।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত - ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়

২। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অধ্যাপক জগৎ লাহা

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. সুকুমার সেন

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ড. সুবোধ চৌধুরী

৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। সরাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ - ড. ক্ষুদিরাম দাস

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা - ড. ভূদেব চৌধূরী

৮। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা - ড. শ্রীকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়

৯। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা - গোপাল হালদার

১০। বাংলা উপন্যাসে স্বদেশ চিন্তা - ড. শ্যামল রায়

চতুর্থ একক

স্বাধীনতা উত্তর সাহিত্য এবং সমাজ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা

টিপ্পনী

৪.১. ভূমিকা

১৯৪৭ থেকে ২০০০ খ্রীস্টাব্দ সময়কালের সাহিত্যধারার নানা বিভাগ সংক্ষেপে পর্যালোচনা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। একক প্রচেষ্টায় সাহিত্যের নানা দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্যসূত্রে তুলে ধরাও সহজ ব্যাপার নয় তবু এই কাজটা শুরু করা দরকার। কারণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অর্থাৎ উনিশশ একচল্লিশ (১৯৪১) থেকে সাম্প্রতিক কালের বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাস এখনও সেভাবে লেখা হয় নি। একবিংশ শতকের প্রথম দশক বেশ কিছুদিন হলো পেরিয়ে এসেছি। অতএব একাজ যত কঠিনই হোক, তবু শুরু করতে হবে।

আর একটা কথা, দশক ধরে সাহিত্যবিচার যথাযথ কিনা তা নিয়ে তর্ক আছে। চল্লিশের দশকে যাঁরা লিখেছেন তারা হয়তো বিশ তিরিশের দশকেই লেখালেখির জগতে এসেছেন এবং চল্লিশের পরে পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর দশকেও তারা সমানভাবে সৃষ্টিশীল ও খ্যাতিমান। তারা যেমন আছেন তেমনি চল্লিশ থেকে প্রথম শুরু করেছেন এমন অনেক লেখকই নতুন এসেছেন, তাঁদের প্রবণতাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য শিল্পকলায় - সেটাই গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। অর্থাৎ পূর্বাপর বিবেচনায় দেশকাল সমাজের পরিবর্তনের নিরিখে, এমন লেখা ও লেখককে আমরা পাই, সেই সব স্রষ্ঠা ও তাদের সৃষ্টিকে মান্য করেই সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমধারাটি বিন্যস্ত করতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতা ও সংবেদনশীল মনোভঙ্গি সহকারে। তাই আমাদের আলোচ্য স্বাধিনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি বিচারে দেশকাল সমাজ নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব পাবে।

৪.১. উদ্দেশ্য

স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলার রাজনীতি ও সমাজ সাহিত্যে ঘটল অভাবনীয় পরিবর্তন। দেশ - কালের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে নানা পরিবর্তন যেমন আসল তা সাহিত্যে ও স্থান পেল। বাংলা সাহিত্যের বিষয় আঙ্গিক বৈচিত্রে নিয়ে নানা পরীক্ষা

টিপ্পনী

নিরিক্ষা চলতে থাকল সাহিতে শ্রষ্ঠা দের মধ্যে। জীবনের যেমন টানা পোড়ন চলেছে সাহিতে তেমনি নানা টানাপোড়নেন ভাঙা চোরার মধ্য দিয়ে জীবনের নানা দিক উঠে আসল। এই ইউনিট টি পাঠে আমরা -

সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থান সমাজ, সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি।

নতুন নতুন সাহিত্যিকদেদর সাহিত্যের আসার আগমন ও তাদের বৈচিত্রময় সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা দেখতে পাব।

মধ্যবিত্ত জীবন, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সম্পর্কে আমাদের সন্ধান দেয়।

সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, পত্রপত্রিকার প্রকাশ ও বিষব বৈচিত্র আমাদের সামনে উঠে আসে।

৪.৩. সমাজ রাজনীতি নির্ভর পরিবেশ

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ বাঙালীজীবনে স্মরনীয় কাল। খন্ডিত স্বাধীনতা লাভ একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নভঙ্গের কাল। বাঙালীর জীবনে এতবড় এবং এমন ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আগে কখনও ঘটেই। বাঙলাদেশ আর বাঙালী নিজের বাসভুমিতে পারের দ্বারা বিভক্ত। বিচ্ছিন্ন, উৎখাত ও ছিন্নমূল হতে বাধ্য হল । দেশের সাধারণমানুষ এই অন্যাব নিষ্ঠুরব্যবস্থা মানতে পারেনি। এমন কী সে সময় দেশের একাংশ মানুষের কাছে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে মনে হয়েছিল। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা স্বাধীনতা উত্তর বাঙলাদেশের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়সমস্যা বলে চিহ্নিত হয়েছিল।

আসলে চল্লিশের দশক শুরু থেকেই উত্তাল আলোড়িত কাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯ -৪৫), মন্বন্তর (১৯৪৩) এবং এর হাত ধরে কালোবাজারী, মজুতদারী মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ভয়াবহমন্বন্তর ও যার পরিনামে খাদ্যের আশায় গ্রামের হাজার হাজার মানুষের কলকাতা শহরে ভিড় ও খাদ্য না পেয়ে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষকে খিদের বলি হয়ে প্রাণ দিতে হল। অসংখ্য মানুষের জীবন চিত্রে ওলোট পালোট হয়ে গেল। বেঁচে থাকার তাগিদে আর খিদে মেটাবার আশায় দিভিক্ষ পীড়িত মানুষ। বিশেষও মেয়েদের

বিপথে নামালো মন্বন্তরের কালে উদ্ভূত এক শ্রেনীর লোভী স্বার্থপর দালা শ্রেনী টোউট বললে এদের সেদিন চিহ্নিত করা হয়িছিল। অনেকেই হারিয়েছিল সম্ভ্রমবোধ, ন্যয়নীতি । মূল্যবোধের অবক্ষয় এই সময়ের এক ভয়ঙ্কর বাস্তব চেহারা । অবশ্য বিশ্বযুদ্ধের কালেই দালাল , ফড়ে, ধান্দাবাজ শ্রেনীর জন্ম হয়েছিল। তারাই মানুষের চরম দুর্গতির দিনে সে মন্বন্তর বা দেশভাগ সীমান্ত পেরিয়ে আসার কালে সীমানা জুড়ে দুর্নীতি, অনাচারে লিপ্ত হয়ে সাধারন মানুষকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলল । এদের উদ্দেশ্য ছলেবলে কৌশলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে প্রচুর টাকা রোজগার ও মূল্যবোধহীন কালোবাজার কে টিকিয়ে রাখা। সে সময়ের আর্থব্যবস্থাকে এরাই শাসন করেছিল বললে ভুল বলা হবে না । আর্থসামাজিক অবক্ষয় অত্যন্ত দ্রুত বঙ্গসমাজকে ক্ষয়িষ্ণু ও সংকটজনক করে তুলেছিল এই নতুনশ্রেনী। এদের আগ্রাসী লোভ লালসা চক্রান্তের শিকার হতে হয়েছিল সর্বহারা ক্ষুধাকাতর আশ্রয়হারা বিপন্ন মানুষগুলিকে। এরই ফল স্বরুপ অসুখী সময়ের চলল পঞ্চাশ, ষাটের দশকেও । স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতা উত্তরকাল শুধু রাজনৈতিক হস্তান্তরের ইতিহাস নয়, সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রেও যুগান্তর সূচানা করল। বাস্তবিক এদেশ থেকে সেদিন রাতারাতি কর্পূরের মত উবে গেল মনুষ্যত্ব, ন্যায়বোধ, সুস্থজীবন চেতনা। সীমানার বেড়ায় শুধু নয় । শিয়ালদহ থেকে শুরু করে স্টেশন সংলগ্ন অস্থায়ী বাসস্থানের চারপাশে, ট্রানজিট ক্যাম্পগুলিতে নির্বাসিত ভিটেমাটি হারা, স্বজন-পরিজন হারা মানুষের ভিড়ের মাঝখানে এই নতুন দালাল শ্রেনী, ফড়ের দল লাভের আশায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। অসহায় সর্বহারা মানুষগুলির সাধ্য কী। এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য, প্রতিরোধ গড়ে তোলবার শক্তি সামর্থ কোথায়?

এই সময় সমাজ ও মানুষকে বারবার আত্মঘাতী দাঙ্গার মুখোমুখি হতে হয়েছে। স্বাধীনতা আসছে এই সম্ভবনা যত জোরালো হয়ে উঠল ১৯৪৫ থেকে ততই মানুষের প্রেমপ্রীতি, সহবস্থানের শান্তি নষ্ট হতে শুরু করল। ১৯৪৬, ৪৭, ৫৪, ৬৪ র দাঙ্গা প্রান বিধ্বংশী রক্তক্ষয় যেন বিনাশকালকে প্রকট করে তুলল। মানুষের সমস্ত আত্মবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি আস্থা ও মূল্যবোধকে ভেঙে মুচড়ে দুমড়ে দিয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এতদিন পাশাপাশি বাস করেও এখন একে অপরের চোখে শত্রু । ভেঙে গেল গ্রামীন সামাজিক বিন্যাস ও গ্রামীন আর্থসামাজিক মেরুদন্ড । অর্থনৈতিক সামাজিক পারিবারিক কাঠামো। মানবিক মূল্যবোধ, অনুভূতি, আবেগ সবই নষ্ট হয়ে গেল অথবা বদলে গেল। এই সময় মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল। স্বার্থপর শহর যেখানে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

গ্রামের মানুষ বাঁচবার আশায়, খাবারের আশায় ছুটে আসছিল - সেই শহর নির্বিকার, নির্বিকল্প। শহরের মানুষের নগ্ন স্বার্থ ফুটে উঠল তাদের আচার আচরনে। তারাও স্বার্থের কারনে একে অপরকে টেক্কা দিয়ে আগে লাভবান হবার আশায় ছুটছে - 'কে , কার আগে স্বর্গে পৌঁছবো, নীলামে কার ঘরবাড়ি, সমপ্তি কত দামে কিনে নেওয়া যায় তার চেষ্টায় সকলেই ছুটছে। যুদ্ধ মন্বন্তর দাঙ্গা হাতধরাধরি করে এসে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়েছে বাঙালী জীবনে, সমাজে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে টলিয়ে দিয়েছে। হয়তো নিরাশ হয়ে গ্রামের মানুষ মরতে মরতেও শহরের কাছে প্রোত্যাশা পূরন করতে না পেরে ভাঙা গ্রামে ফিরে গেছে বা কেউ কেউ ভিটে আঁকড়ে ও বাংলায় তখনও থাকতে চেয়েছে কিন্তু তারাও অভিজ্ঞতায় পোড় খেয়ে অনেক কিছু শিখেছে, তাদেরও বদল ঘটেছে। মন্বন্তর তাড়িত যে মানুষগুলি এত আঘাত উপেক্ষা সত্ত্বেও বেঁচে থাকল তারা অনেক দাম দিয়ে শিখল লড়াই করতে। ১৯৪৩ এর তিন বছর পরেই এই মানুষগুলি ডাক দিল 'জান দেব তবু ধান দেব না'। জোতদার জমিদারের হাত থেকে ধান বাঁচাতে সংগঠিত কৃষকেরা জোট বেঁধে ভাঙ্গার লড়াইয়ে সামিল হল। কিন্তু সুকৌশলী স্বার্থপর একদল বাঁধালো দাঙ্গা, দেশভাগের জিগির উঠতেই পাবনা, নোয়াখালি, কলকাতা জড়িয়ে পড়ল ৪৬এর দাঙ্গায়। এবং পরে আরও অনেক দাঙ্গার মুখোমুখি হল মানুষ দেশভাগ ও সীমান্ত পেরিয়ে এপার বাংলায় আসবার পথে। রাজনৈতিক অসন্তোষ ক্ষোভ সত্ত্বেও দেশভাগ ঠেকানো যায় নি। কংগ্রস ও মুসলিম লীগ ওপারের চেনা মানুষটাও হবে গেল বিদেশী। উত্তর স্বাধীনতা পটে বঙ্গবিভাগের কারনে পশ্চিমবঙ্গকে বহন করতে হল ক্রমাগত আসা আশ্রয়হীন মানুষের চাপ। ১৯৫০ এর আদম সুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে আসা উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২৩,০৪, ৫১৪ জন - এটি সরকারি তথ্য। সআবভাবিক ভাবেই ভেঙে পড়ল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি, খাদ্যনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন শৃঙ্খলা বিপুল উদবাস্তু সমস্যা, বেকারত্বের সমস্যা, খাদ্যাভাব নিয়ে স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ব্যবস্থা প্রবল সঙ্কটের মুখোমুখি হল। খাদ্যনেই, বস্ত্র নেই, জীবিকা নেই, বাস্তুহীন মানুষকে আশ্রয় দেবার মত ছাইনি নেই, ছাউনি তৈরির জায়গাও নেই। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনেও এল ভয়ঙ্কর আঘাত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে ক্রমে দানা বাঁধতে লাগল অসন্তোষ, বিদ্বেষ। পূর্ববঙ্গের যে মানুষগুলি ছিল আপনজন, তারাই এখন তাদের কাছে, 'বাঙ্গাল', 'রিফিউজি' বলে চিহ্নিত হতে লাগল। মধ্যবিত্তদের মানবিক সহানুভূতি উদারতা ক্রমেই নিঃৎশেষ হয়ে যেতে লাগল। আসলে তারাও বিপর্যস্ত, তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। সবমিলিয়ে এ বঙ্গের মানুষও অসহায়। বিপন্ন দিশাহারা। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে পূর্ববঙ্গ থেকে

আশ্রয়হারা আগত মানুষেরা হয়ে উঠেছে প্রতিদ্বন্দী। বদলে যাচ্ছে মানসিকতা, বদলে যাচ্ছে সম্পর্ক। দুই বাঙলার মধ্যবিত্ত মানুষেরা তখন বিপর্যস্ত অদ্ভূত আত্মসংকট বা identity crisis এ জর্জরিত। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পর থেকেই মধ্যবিত্তের বা এলিট মধ্যবিত্তের পুরোনো চেহারাটা সম্পূর্ন বদলে যেএ লাগল। আসলে সময়টাই ছিল টানা পোড়নে আলোড়িত। চারিদিকে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা, আর্থিক অনটন, চাকরির ক্ষেত্রে প্রবল সংকোচন যে কোন সময় সদাগরী অফিস ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে চাকরি যাবার আশঙ্কা মধ্যবিত্ত চাকরিজীবি বাঙালীকে ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে। সময়ের এই সঙ্কটলগ্নে ব্যাক্তি তার পরিবার সকলেই বাধ্য হয়ে এতদিনের লালিত সংস্কার, মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে শুধু টিকে থাকবার লড়াইয়ে ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আসা ছাড়াও গ্রাম থেকে শহর পুরো পরিবার শুধু বাঁচার আশায় শহরে চলে আসছে। যাকে বলা যায় force migration সেতাও ঘটেছে এই সময়ে। সামান্য চাকুরে সন্তান বাধ্য হয়েই স্ত্রী-পুত্র, কনা, মা, বাবাকে নিয়ে শহরের অপরিসর বাসাবড়িতে কোনোরকমে জীবনধারন করেছে। কলকাতা শহর ছাড়িয়ে শহরতলিতে ও ভিড় জমিয়েছে তারা নয়তো 'বারোঘর এক উঠানের' বাসিন্দা হয়েছে তারা। কিছুদিন পরে শহরের ঘর ভাড়া, সন্তানদের খাদ্য, ওষুধ, শিক্ষা দিতে অর্থের টানাটানি দেখে ঘরের বউ, মেয়েরাও পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মেয়েদের দেখে চাকরীর উদদেশ্যে বাইরের জগতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। একে একে রক্ষনশীলতার দেওয়াল নিজেরাই ভেঙে ফেলেছে। তেমনি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত যারা একদিন শহরের নামী পাড়ার বাসিন্দা ছিল। তারাও অবস্থার ফেরে অর্থের টানাটানিতে অভিজাত পাড়া, অভিজাত পরিবার ভেঙে বাধ্য হয়েই বেরিয়ে ক্রমে 'কিনু গোয়ালার গলি'র বাসিন্দা হয়েছে এমন নজির ও মিলবে। অর্থাৎ নাগরিক মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে তাদের জীবনধারা, মূল্যবোধ। বদলে যাচ্ছে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান।

সময়ের পরিবর্তনে বদলে যাচ্ছে রাজনৈতিক বোধ ও আদর্শ। স্বাধীনদেশের হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গ ক্রমেই শিক্ষিত নতুন প্রজন্মকে বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে আকৃষ্ট করেছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এই পরিবর্তনটা বেশিমাত্রায় ঘটতে শুরু করেছিল। এভাবেই স্বাধীনতার পর থেকে নানা সঙ্কট সংশয়, দ্বিধা, দোলাচালতার মধ্যে দিয়ে প্রবহমান সময়ের চলমানতায় তাল মিলিয়ে মানুষ এগিয়ে চলে। এই সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতেই টানাপোড়নের দ্বন্দ্ব

টিপ্পনী

সংকটের মধ্যেই পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর এর দশকের বা তারপরের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির রূপ রূপান্তর গড়ে উঠেছে।

টিপ্পনী

৪.৪. স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাস

স্বাধীনতা উত্তর কথা সাহিত্যের দুটি শাখাই, ছোটগল্প এবং উপন্যাস বহুলেখকের লেখায় সমৃদ্ধ এবং গতিমুখর। বিষয় বৈচিত্র এবং প্রকরণ রীতির নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অব্যাহত আছে। আলোচনার সূচনাতেই একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল - সাহিত্যের কোনো ধারনাকেই কোনো বিশেষ দশকের মধ্যে ধরা সম্ভব নয়। কারণ পূর্ববর্তী দশকেই হয় তো কোনো কোনো লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনায় তাঁর সমকালকে অতিক্রম করে তিনি আগামীর বার্তা দিয়েছেন। পূর্ববর্তী দশকেই যাঁদের প্রতিষ্ঠিত লেখক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তাঁরাও স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক দশক ধরেই অনেক উল্লেখ যোগ্য উপন্যাস, ছোটোগল্প লিখে চলেছেন। স্বাধীনতার আগেই বিভূতিভুষন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও কল্লোল পর্বের তাঁরাও লেখা বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ও অন্যান্য উল্লেখ যোগ্য স্বাধীনতা উত্তরকালেও বেশ উল্লেখযোগ্য লেখা উপহার দিয়েছেন। এইসব বর্ষিয়ান প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের রচনাতেও বর্তমান সময়ের নানা প্রবণতা অস্থির সঙ্কটময় সময়ের কথা উচ্চারিত হয়েছে। আবার সেই সঙ্গে চল্লিশ উত্তর চল্লিশে যাঁদের আর্বভাব হয়েছে, যেমন- সুবোধ ঘোষ, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সতীনাথ ভাদুড়ী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিমলকর, রমাপদ চৌধূরী, বিমল কর, রমাপদ চৌধূরী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু ও বেশ উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প উপন্যাস লিখে পাঠককে মুগ্ধ করেছেন। এঁরাও পরবর্তী পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর দশকেও সমান গুরুত্বপূর্ণ লেখক রূপে স্বাধীনতা উত্তর কথা সাহিত্যকে পরিপ্পুট ও সমৃদ্ধ করেছেন। এভাবে গড়ে উঠেছেন প্রবহমান সাহিত্যধারা। একথা মনে রেখেই দশক অনুযায়ী উত্তর স্বাধীন বাংলা কথা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নির্নয় সমীচীন বলে মনে হয়।

অগ্রজ কথাকারদের লেখায় যেমনদেশভাগ, দাঙ্গা ও মন্তরের নির্মম অভিজ্ঞতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে সে সময়, তেমনি ঐ সময়ের নবীন কথাশিল্পীদের লেখায় সমকালীন বাস্তব বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ১৩৫০ এর মন্বন্তর নিয়ে তারাশঙ্কর লিখলেন 'মন্বন্তর' ও 'ঝড় ও ঝরাপাতা' র মত উপন্যাস। বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'অশনি সংকেত' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'চিন্তামনির মতো

উপন্যাস। ঐ সময় অধিকাংশ লেখকের কাছেই 'মন্বন্তর' শুধু খাদ্যের মন্বন্তর রূপে। গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস 'ঊনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথ 'ও 'তেরোশো পঞ্চাশ'। নবেন্দু ঘোষের 'ডাক দিয়ে যাই' উপন্যাসে উত্তর চল্লিশের অস্থির সময়, অনিশ্চিত জীবন, আশ্রয় হীনতা, ক্ষুধা ও খাদ্যের জন্য হাহাকার ও সেই মানবিক সম্পর্কের অবক্ষয় চিত্রিত হয়েছে।

টিপ্পনী

যুদ্ধের কারনেই যে ভয়ানক মন্বন্তরের সৃষ্টি এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন মনোজ বসু তাঁর সৈনিক উপন্যাসে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'রাত্রি', সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জুলি', রমেশচন্দ্র সেনের 'শতাব্দী উপন্যাসের যুগচিত্র স্পষ্ট এসব উপন্যাস চল্লিশ দশকের শেষার্ধে রচিত।

১৯৪৫ এ সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী' উপন্যাসে আগষ্ট আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মানবিক আত্মিক সম্পর্কের সঙ্ক নিয়ে অসামান্য উপন্যাস লিখে সাড়া জাগালেন। লেখক হিসেবে এ গ্রন্থই তাঁর প্রথম রচনা। গোপাল হালদারের 'ঊনপঞ্চাশী' উপন্যাসে বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের ও গান্ধীজির ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর লেখা 'ত্রয়ী' - একদা অন্যদিন আর একদিন (একসঙ্গে উপন্যাসটির নাম 'ত্রিদিবা') উপন্যাসেও আগষ্ট আন্দোলন। কফুনিষ্ঠ চরিত্রের ভূমিকা ইত্যাদির মাধ্যম চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক বাতাবরনটি স্পষ্ট হয়েছে। এই বিষয় নিয়েই মনোজ বসু লিখেছেন 'ভূলিনাই', 'আগষ্ট ৪২' নামে উপন্যাস। বনফুল এই একই বিষয় নিয়ে লিখেছেন 'অগ্নি' নামে একটি উপন্যাস। তাঁর লেখা 'স্বপ্ন সম্ভব' উপন্যাসে ১৯৪৬ এর দাঙ্গার প্রেক্ষাপট ও নিষ্ঠুর অস্থির সময়কাল বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। দুটি উপন্যাসই তিনি লিখেছেন সাতচল্লিশেদর স্বাধীনতার সমসময়েন। ১৯৪৭ এ সুবোধ ঘোষ লেখেন 'গঙ্গোত্রী' নামে একটি উপন্যাস ল সেখানে গান্ধী ভাবাদর্শ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

সরাসরি স্বাধীনতা দেশভাগ নিয়ে তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায় উপন্যাস লেখেননি। তবে বিভূতিভূষনের 'আচার্য কৃপালীনী কলোনি' গল্পে ব্যাডক্লিফের অন্যায় দেশভাগবন্টন সীমানা কমিশনের সে সময়কিআর ভূমিকা তিনি গল্পে কৌশলে প্রয়োগ করেছেন। প্রসঙ্গত দেশভাগ নিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী লিখেছেন 'গণ নায়ক' এর মতো বিদ্রুপাত্মক ছোটোগল্প। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতার কালে ছিলেন কমুনিষ্ট পার্টির বিশেষ সদস্য। তিনি তাঁর লেখা 'চিহ্ন', 'স্বাধীনতার স্বাদ' প্রভৃতি উপন্যাসে স্বাধীনতার কালে দেশ জুড়ে চাল সঙ্কট, কালোবাজারীতে সমাজের

গভীরক্ষয় ক্ষতিকে চিহ্নিত করেছেন।

টিপ্পনী

সতীনাথ ভাদুড়ি স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরূপে সাধারণ মানুষের ভূমিকা তাদের আবেগ, বেদনা, হতাশা প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন 'ঢোঁড়াই চরিত্র মানস' ২টি চরণ।

স্বাধীনতা ও সঙ্কট নিয়ে ,বাস্তুহারা মানুষের প্রাণবাঁচানোর লড়াই চলেছিল ট্রানজিট ক্যামচা প্রভৃতিতে। সে বিবরন আমরা পাই তাঁর লেখা 'নির্বাস', 'গড়শ্রীখন্ড' উপন্যাসে। পরে লেখাই ১২৬২ তে লেখেন 'উদ্বাস্তু' নামে আর একটি উপন্যাস। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আগামী' নারায়ন সান্যালের 'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প' অসীম রায়ের দেশদ্রোহী, কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর 'সীমান্ত পেরিয়ে' সমরেশ বসুর 'সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা' ও আশির দশকে জীবনের শেষলগ্নে লিখলেন 'খন্ডিতা' নামে উপন্যাস। এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা 'এপার গঙ্গা', নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'বিদিশা', 'মেঘের ওপর প্রাসাদ' সরোজ রায় চৌধুরীর 'নীল আগুন'। দেশভাগের সময় থেকে সরে এসে অনেক পরে লিখলেন মনোজ বসু 'সেইসব গ্রাম সেইসব মানুষ'। অতসী বন্দোপাধ্যায় লিখলেন 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজ' (ত্রয়ী উপন্যাস) । প্রফুল্ল রায়ের কেয়া পাতার নৌকা ২খন্ড বা আর ওপরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন 'অর্জুন' ও 'পূর্বপশ্চিম' ২খন্ডের উপন্যাস।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর গুরুত লাভ করল। মধ্যবিত্ত তার এতদিন ধরে লালিত মূল্যবোধ হারিয়ে অসহায় একাকীত্বের শিকার হয়ে উঠল। বাংলা গল্প উপন্যাস মধ্যবিত্তের কঠিন বাস্তব চেহারাটা ফুটে উঠতে গল্প উপন্যাস মধ্যবিত্তের কঠিন বাস্তব চেহারাটা ফুটে উঠতে লাগল। নরেন্দ্র নাথ মিত্রের 'চেনা মহল', 'দ্বীপপুঞ্জের', সন্তোষ কুমার ঘোটের 'কিনু গোয়ালারগলি', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান', 'মীরার দুপুর' প্রভৃতি উপন্যাসে নির্মম বাস্তব ছবি ফুটে উঠল। নরেন্দ্র নাথ মিত্রের লেখায় পাওয়া গেল যৌথ একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের ভাঙনের নানা ছবি, পারস্পারিক আত্মীয়তার বন্ধন ও আত্মিক নির্ভরতার জায়গাটা ক্রমেই নষ্ঠ য়ে যাওয়ার বাস্তব ছবি পাওয়া গেল। ননী ভৌমিক, নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী এই সময়ের কথাকার। ১৯৫৬ তে বিমল কর লিখলেন দুখন্ডের উপন্যাস 'দেওয়াল'। এই উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের সার্বিক ছবি পাওয়া যায়। সংসারের প্রয়োজনে দেওয়াল উপন্যাসের

নায়িকা ঘরের বাইরে বেরিয়েছে। সংসারের অভাব মেটাতে অফিসে কেরানীবৃত্তি গ্রহন করেছে। ইতিমধ্যেই সমরেশ বসু উত্তরঙ্গ, নয়নপুরের মাটি, বি. টি. রোড়ের ধারে। শ্রীমতী কাফে উপন্যাসে নৈহাটি, আটপুর সংলগ্ন গঙ্গাতীরবর্তী শ্রমিক জীবন কে উপন্যাসের বিষয় করেছেন। ১৯৫৭ তে গঙ্গা উপন্যাসে তিনি অন্ত্যজ মালোজীবনের স্বপ্ন সংগ্রাম নিয়ে উপন্যাস লিখে নদীমাতৃক বাংলা উপন্যাসের ধারায় নিজের স্থান করে নিয়েছেন। ষাটের দশকেই এই বলিষ্ঠ লেখক 'বিবর' (১৯৬৫), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭), 'পাতক' (১৯৬৯) উপন্যাসে মধ্যবিত্তের বিবর্ণ জীবনের ক্ষয়িত জটিল পরিনতি এঁকে মেকি সভ্যতা, সংস্কৃতির আবরণ ছিন্ন করলেন। বিবরদের নায়কের অস্তিত্বের সংকট ও আত্মজিজ্ঞাসা নিঃসন্দেহে বাংলা উপন্যাসের অভ্যস্ত আদর্শবাদ, রক্ষনশীলতাকে চরম আঘাত করল।

আসলে স্বাধীনতার একদশক যেতে না যেতেই মধ্যবিত্তের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল । পরপর ১৯৫২, ১৯৫৭ র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যর্থতা খাদ্য আন্দোলন একপয়সার ট্রামে ভাড়া বাড়ানোর আন্দোলন, বেকারত্ব প্রভৃতি সাধারন মধ্যবিত্ত ও নবীন যুব সমাজকে ক্ষুদ্ধ - ক্রুদ্ধ করে তুলল। ষাটের ছাত্র আন্দোলন, উত্তাল ছাত্রর রাজনীতি, মিছিল-প্রতিবাদ পালাবদলের ইঙ্গিত দিল । রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই' 'খারিজ', 'বীজ', 'লজ্জা', 'চড়াই' । বিমল করের 'কালের নায়ক', 'শমীক', 'যদুবংশ', সন্তোষ কুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার শ্রীচরনেষুমাকে', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'শেষ বিচার' প্রভৃতি উপন্যাসে নিরালম্ব মধ্যবিত্তের নিসঙ্গ আত্ম যন্ত্রনা, ক্ষোভ, আত্মধিক্কার ভয়ঙ্কর রুপ নিয়ে সময় ও সমাজকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে।

অস্তিত্বহীন যন্ত্রনায় বিক্ষত অস্থির নিঃসঙ্গ মধ্যবিত্ত জীবনের কথা যেমন বলেছেন পঞ্চাশ, ষাট এর দশকের কথা সাহিত্যিকেরা, তেমনি তাঁরা লোকায়ত্ত জীবন, বিলীয়মান গোষ্ঠী জীবনের কৌম ধ্যানধারনা। সংস্কার, বিশ্বাস ও গোষ্ঠী জীবনের অনিবার্য ভাঙন, সংস্কারের বিপর্যয় নিয়েও উপন্যাস লিখেছেন। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বলতে চেয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মহাজনী সমাজ রাজনীতির আত্মকেন্দ্রিক আঘাতে বহুপ্রাচীন আঞ্চলিক কৌমজীবন। গোষ্ঠিজীবনে ভাঙন অনিবার্য হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর কালে আঞ্চলিক প্রক্ষাপটে শাশ্বত উপন্যাসে লিখেছেন শক্তিধর ওপন্যাসিক - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সতীনথ ভাদুড়ী, অদ্বৈতমল্ল বর্মন, সমরেশ বসু, অমিতভূষন মজুমদার, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। হাঁসুলিবাঁকের উপকথা , চোঁড়াই চরিত মানুষ (২টি চরন), তিতাস একটি নদীর নাম, বি. টি রোড়ের ধারে, গঙ্গা,

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মহিষকুঁড়ার রূপকথা, কুবেরের বিউষয় আশয়, অলীক মানুষ এই পর্বের লেখকদের লেখা উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উপন্যাস। এই আঞ্চলিকতার সন্ধান পরেও হয়েছে সত্তর, আশির দশকের প্রতিষ্ঠিত নবীন লেখক অভিজিৎ সেনের 'বহুচন্ডালের হাড়' ভগীরথ মিশ্রের আড়াকাঠি, মৃগয়া, শচীন দাশের বাদাবন সুন্দর বন নিয়ে লেখা উপন্যাসে। নলিনী বেরার 'শবর চরিত্র' বা শবর পুরান, সায়ন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'গহিন গাঙ' আঞ্চলিক উপন্যাস ধারায় উল্বলেখযোগ্য সংযোজন। পুরোপুরি আঞ্চলিক শর্ত রক্ষা না করেও ঐতিহ্যময় গ্রামজীবনের ভাঙন বিরোধ নিয়ে চল্লিশের দশক থেকেই একাকধিক উপন্যাস লেখা হয়েছে। সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' গুনময় মান্নার লক্ষ্মীন্দর দীগর, শালবনি, অমিয় ভূষন মজুমদারের 'গড় শ্রীখন্ড', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'তৃণভূমি' রমাপদ চৌধুরীর 'জীবন পদাবলী প্রভৃতি উপন্যাস। পঞ্চাশ ষাটের দশকের দেশকাল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গ্রাম জীবনের ভাঙাগড়ার ছবি, ক্ষেতমজুর চাষী ও শ্রমিক জীবনের পাশাপাশী কুসাদজীবি, মহাজন পীড়িত গ্রামীন মানুষের চরম বিপর্যয়ের ছবি আঁকা হয়েছে। দেবেশ রায়ের তিস্তা পারের বৃত্তান্ত, সত্তরের কথাকার অমর মিত্রের 'পাহাড়ের মত মানুষ' ঝাড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'জলের আয়না' প্রভৃতি উপন্যাসে।

উত্তর স্বাধীনতার অল্পকাল পরে একদল লেখক বর্তমান অস্থির সময়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবার অতীতাশ্রয়ী ঐতিহনাসিক উপন্যাসে রোমান্স রচনার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বস্তুত পক্ষে ১৯০৩ এ 'চোখের বালি' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর থেকেই কয়েক দশক বাস্তবধর্মী মনস্তত্ত্বমূলক ওউপন্যাস, চরিত্রর অর্ন্তবয়ন প্রধান হয়ে উঠেছিল এবং স্বাভাবিক ভাবেই ঐতিহাসিক উপন্যাস ধারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, 'সাতচল্লিশের আগে থেকেই এবং পঞ্চাশের দশক পুনরায় নতুন করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার প্রবণতা দেখা গেল। ইতিহাসের অতীত ককে ওযেমন লেখকরা অবলম্বন করেছেন, তেমনি উনিশ শতকের সামাজিক জীবন, বিরোধ চরিত্র, দেশপ্রেম ও প্রেমের অঙ্গিকার এসময়ে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যনাসগুলি বহুমাত্রিক ওহয়ে উঠল। একসাথে একালের ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওউঠল একসাথে সমাজকাল সচেতন বৃত্তের জীবনের কথা - যেখানে অনেকাংশই সামাজিক, রাজনৈতিক উপন্যাসের অনেক শর্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সময় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা সমৃদ্ধ হয়েছিল শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, প্রমথনাকথ বিশী, তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের হাতে। সদ্য স্বাধীনতার সময় কালেই নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন ১৯৪০ এ 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠ'। ১৯৫৬ তে 'পদসঞ্চার'। উত্তর স্বাধীনতাপর্বে তারাশঙ্কর

লিখেছেন একাধিক ঐতিহাসিক উপন্যাস - 'গন্নাবেগম', 'ভুবনপুরের হাট', 'কীর্তিহাটের কড়চা' ও 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাস। ১৭৯৯ থেকমে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারী ওবিলোপ আইন প্রবর্তনের সময়কাল নিয়ে লেখা সাতপুরানের কাহিনী 'কীর্তিহাটেদর কড়চা', সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে লিখলেন নতুন কালের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অরন্যবহ্নি'।

প্রবল ঐতিহাসিক চেতনা ছিল বিভূতিভূষন বন্দোপপাধ্যায়ের রাজা রাজড়ার ইতিহাস রচনার কথা তিনি তিনি কোনোদিন ভাবেন নি। তাঁকে ওআকর্ষন করত সাধারন মানুষেদর সযত্নকে লালিত সভ্যতা সংস্কৃতি, শৌর্যবীরত্ব। তাই তিনি 'আরন্যক' উপন্যাসে রাজা দোবরুপান্নার মধ্যেই খুঁজে পপেয়েছিলেন অনার্যসভ্যতার মর্মবানী। তাঁর লেখা শেষ উপন্যাস 'ইচ্ছামতী' ইতিহাস চেতনার সুগভীর ফসল। ১৮৫৭র সিপাহীজ বিদ্রোহকে স্মরণ করে প্রমথনাথ বিশী লিখলেন 'লালকেল্লা' গজেন্দ্রকুমার মিত্র লেখেন 'বহনিশিখা' উপন্যাস। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন বুকে নিয়ে সুদূর ঝাঁসী থেকে গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে জগদ্দলে। গঙ্গাতীরে ঠেকল অচৈতন্য সৈনিক তাকে ঐ তীরের মাঝি মল্লার ওনাম ওদিলক লখাই - এমন এক কাল্পনিক চারিত্রিক নিয়ে সমরেশ বসু লিখললেকন 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাস। সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তন ও নৈহাটি চাঁপদানি জগদ্দল শিল্পঞ্চলের সূচনার ঐতিহাসিক দলিল উত্তরঙ্গ উপন্যাস। তকবে বঙ্কিমোচন্দ্রের পর যথার্থ সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাষের ওশিল্পাঙ্গিক রচনায় একনিষ্ঠ শরদিন্দু বন্দোপপাধ্যায়ের রচনা করেন এই পর্বের সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক রোমান্স। কুমার সম্ভারের কবি 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' ঐতিহাসিক রোমান্স এবং তুঙ্গভদ্রার তীরে ঐতিহাসিক উপন্যাস। শরদিন্দুর এই ধারা সমৃদ্ধ হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর লেখা লালবাঈ, রবীন্দ্র নাথ দাশের 'গড়নাসিমপুর' উপন্যাসে।

তবে পরবর্তী লেখকরা ইতিহাস চেতনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর উপন্যাস রচনার পরিবর্তে। 'আঁধার মানিক' উপন্যাসের ভূমিকায় নতুনকালের ইতিহাস চেতনার সদর্থক ব্যাখ্যা করেছেন মহনাশ্বেতা দেবী -

ইতিহাসের মুখ্যকাজই হচ্ছে মানুষের অন্তমুখী পুরুষার্থক বাইরের গোলমাল, ওসংগ্রাম ও সমারোহেদর আবর্জনা এবং ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে অন্বেষন করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া। আর এখনি এর ভিতর পানে চোখ মেলার দরুন অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে সমাজনীতি, ও অর্থনীতি পটভূমি তৈরী করে। তার সাফল্য ও সিদ্ধি এনে

টিপ্পনী

দেয়। এই সমাজনিতি অর্থনীতি। মানে লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক জীবন ব্যবস্থা।

টিপ্পনী

এই মানকসিকতা নিয়ে মহাশ্বদেতা দেবী লিখেছেন 'মধুবর মধুর', 'আধারমানিক', 'কবি বন্দ্যোঘটির জীবনও সত্য', 'অরন্যের অধিকার'। অমিয় ভূষন মজুমদার লিখলেন নীল ভুঁইয়া - 'রাজনগর', মধু সাধুখাঁ', 'চাঁদবনে' উপন্যাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেইক সময়', 'প্রথম আলো'য় উনিশ শতকের ও পরিবর্তমান সমাজ ইতিহাসের আলোখ্য রচিত হয়েছে। তাঁর লেখা 'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসে দেশভাগের স্মৃতিবেদনা ও পরবর্তী সময়ের নানা সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক কআলেখ্য। তাঁর সমসাময়িক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় অরন্য ইতিহাসের বিশিষ্ট দারাতাকাকে নিয়ে জীবনরহস্যের ও মহত্বের অসামান্য দিক উন্মোচন করে আজকের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞাএক ব্যাপক বিস্তৃতি দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এইকালপর্বেই অতীত ইতিহাসের কালপর্বে বাস্তবের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সংকট সমাধান অন্বেষার মতোই রামায়ন মহাভারত পুরাণ মঙ্গলকাব্যের মিথ অবলম্বন করে পুরান কথার নবায়ন ঘটালেন। প্রমথনাথ বিশী লিখলেন 'পূর্নাবতার', গজেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পাঞ্চজন্য' রবীন্দ্রনাথ দাশের 'শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব', সমরেশ বসু 'শাম্ব' উপ্যনাস।

অতীত মুখীনতার আর একটি পদ্ধতি উত্তর স্বাধীন কথা সাহিত্যে ক্রমেই বিশিষ্ট শিল্পরূপ বা কর্ম বলে গন্য হয়।। সে ধারাটি সামাজিক চেতনায় ভরপুর বেদনো, বিষন্ন স্মৃতি মেদুর আত্মজীবন অবলম্বনে লেখা উপন্যাস। ফেলে আসা অতীত, শৈশব সেই সব গ্রাম্য মানুষের কথা। মনোজ বসু লিখেছেন 'সেইসব বন গ্রাম ও মানুষ', অতীন বন্দোপাধ্যায় লিখলেন দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে অসামান্য উপন্যাস নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে। সেখানে বালক সোনার স্মৃতিতে ধরা পড়েছে শীতলতা আর মেঘনার মায়ায় ঘেরা ফেলে আসা গ্রামের সুখের কথা। তেমনি প্রফুল্ল রায়ের কেয়া পাতার নৌকা', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'উজান' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্বপশ্চিম' উপন্যাসের প্রথম খন্ড। গৌর কীশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা 'অলীক মানুষ'। এই স্মৃতি বেদনা বিধুর উপন্যাস ধারায় শান্তা সেনের 'বিষাদ বৃক্ষ, সুনন্দা শিকদারের 'দয়াময়ীর কথা' উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

স্বাধীনতা উত্তরকালে সংস্কৃতি - শিক্ষা, জীবিকা, রাজনীতি সব কিছুর কেন্দ্রভূমি হয়েছে কলকাতা। নানা অঞ্চল থেকে আসা মানুষের ভিড়ে কলকাতা এখন স্ফীত,

আন্দোলিত, উত্তেজিত কোলাহল মুখর। তার আয়তন বিস্তৃতি যেমন ঘটেই চলেছে। জটিলতা ও তেমনি বিচিত্র ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আলোচনা, সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু। কলকাতা যেন নিজেই তার পুরনো প্রাসাদ, পথঘাট, অলি-গলি আর তার বিপরীতে নতুন কালের বহুতল, বিপনন কেন্দ্র, বাজারী চেতনায়, শিক্ষা ব্যবস্থার নিত্যজটিল নাগপাশে যানবাহনের ধোঁয়ায় নিজেই রহস্যময়ী ওচরিত্র হয়েছে। এই শহরের নাগরিক মানুষের মানবিক টানাপোড়োন, রাগ ক্ষোভ বেদনার বর্নময় প্রকাশ যেন কলকাতার অর্ন্তনিহিত চরিত্র ও ওচারিত্রিক বৈশিষ্ট রূপে কথা সাহিত্যিকের মনে বিশেষ ছায়া ফেলেছে । মনে পড়বে বিমল করের দেওয়াল, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চেনামহল উপন্যাসের কথা । ছটি উপন্যাসে যথাক্রমে নিম্ন মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের আত্মকেন্দ্রিকতা অর্থনৈতিক বিপন্নতার ছবি আঁকা হয়েছে। মতিনন্দি ও এই ধারায় কলকাতার বর্ণময় ছবি এঁকেছেন। অন্যদিকে বিমল মিত্রের কড়ি দিয়ে কিনলাম, সাহেব বিবি গোলাম, 'চলো কলকাতা' উপন্যাসে বনেদী ধনী পচরিবারের অবক্ষয় বিলাস ব্যাসন অনিবার্য ভাঙন তুলে ধরা হয়েছে। ১৯১২ র ইমপ্রম্পমোএন্ট ট্রাসেটর নগর উন্নয়ন নিগমের নিয়ম বড়বাড়ি ভাঙা পড়ল কেন তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর লেখায়।

সন্তোষ কুমার ঘোষ, জোতিরিন্দ্র নন্দী, মতিনন্দী, অসীম রায়, রমাপদ চৌধুরীর লেখায় ষাটের দশকের কলকাতার অস্থির সময় সঙ্কটের ছবি উঠে এসেছে। যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত কলকাতা, অর্থনৈতিক সামাজিক অবক্ষয়ে ক্লিষ্ট কলকাতা অন্যায় ও দুর্নীতিতে জর্জর কলকাতার ক্রমবস্থায় চেহারা এঁদের লেখায় স্পষ্ট হয়েছে। বিষ্ণুদের ভাষায় বলা যায় ' নানা লোভে ক্রুরতার আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত'। স্বেচ্ছাকৃত ভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধ্য রোগে আমাদের স্বপ্নগুলি ছত্রভঙ্গ। তাই ঐক্যতান ছিন্নভিন্ন। অন্ধকার কলকাতায় উচ্চকিফত রাস্তায়, গলিতে।'

সুনীল ওগঙ্গোপাধ্যায়ের 'জীবনযেদরকম' (১৯৭৯) উপন্যাসে কলকাতার নাগরিক জীবনেদর বহুবিধ সমস্যা ছবি আঁকা হয়েছে। নায়ক দীপু নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত হতে হতে একাকী নিঃসঙ্গ, আত্মমগ্ন ও আত্মযন্ত্রনাকয় বিদীর্ন চরিত্র। বিভিন্ন কথা সাহিতিক্যের রচনায় ষাটের দশকের কলকাতা ওচীন-ভারত আক্রমনে বিপর্যস্ত কলকাতা, পরপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যর্থ কলকাতা আশাভঙ্গের হতশা, ক্ষোকভে গুমরে ওঠা রাগী কলকাতার ছবি এঁকেছেন । খাদ্যসমস্যা, বেকারত্বেদর জ্বালা, নীতিহীন রাজনীতির পচরতি বিরূপতায় ক্ষুদ্ধ কলকাতা কখনো গর্জে উঠেছে ষাটের ছাত্র আন্দোলনে '৬৬' র খাদ্য আন্দোলনে, মিছিলে, মিটিঙে প্রতিবাদে ওমুখর অন্য

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এক কলকাতা এগিয়ে কলেজে ৬৭ - ৭০ এর দশকের জ্ঞান ওঅগস্ত বিপ্লবের দিকে। সমরেশ মজুমদারেদর উত্তরাধিকার কালকেও উপন্যাসের কথা মনে পড়বে। রাজনৈতিক অর্থ সামাজিক ক্ষুব্ধতা ও চরিত্রর একাকিত্ব আত্মানুসন্ধান নিয়ে লেখা শুরু হল। এক অর্থে নিজের নির্মোক উন্মোচন ঘটতে দেখা গেল সমরেশ বসুর 'বিবর' (১৯৬৫) শীষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুনপোকা' (১৯৬৬) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যার সুর' (১৯৬৬) উপকন্যাসে। এসময়ের বাংলা উপন্যাসে বহু লেখকই ব্যাক্তি চরিত্রের আত্মজিজ্ঞাসা স্বীকারোক্তি সেই সঙ্গে ' সকলের মাঝে আমি হতেছি একাকী' - এই নিঃসঙ্গতা বোধ ও বিচ্ছিন্ন একাকিত্বকে তুলে ধরেছেন। এরা শুধু প্রেম ও কাম চারিতায় ব্যস্ত থাকেন নি, শুধু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন আকুল নয়। এরা উপলব্ধি করেছে সমাজে, রাষ্ট্রে, পরিবারজীবনে এমন কি ব্যাক্তি চরিত্রর নিজের কাছেও পুরনো ধ্যানধারনা, মূল্যবোধের কানাকড়ি দাম নেই। এইসব উপন্যাসের নায়ক কোথাও সামান্যতম বিশ্বাসের আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। এই বিচ্ছিন্নতা যুগগত কারনো। বিবর, ঘুনপোকা প্রভৃতি উপন্যাস নিঃসন্দেহে দেশকালের পরিবর্তমান প্রেক্ষাপটে ওজটিলতর বাস্তবতা ও মনস্তাত্তিক ওজিলচতার আর একটি নতুন পাঠ (Text) রচনা কোরেছে। ঊনীশশ পয়ষট্টি থেকে সত্তরের দশকে এই ধারাকে পুষ্ট কলরলেন গৌর কিশোর ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরনী হা হা' সন্দীপন চট্টোপাধ্যনায় 'আমার এখন অসুখ নেই' একক প্রদর্শনী, জ্যোতিরিন্দ্রনন্দী 'বিশ্বাসের বাইরে', ' এই তার পুরস্কার' প্রভৃতি উপন্যাসে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 'ঘুনপোকা' ছাড়াও 'পারাপার' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও 'আত্মপ্রকাশ', 'যুবিক যুবতীরা', 'হৃদয়ে প্রবাস' নামে উপন্যাস লেখেন।

স্বাধীনতা উত্তরকালে রাজনৈতিক উপকন্যাষের ধারা ও নানা দিক থেকেই সমৃদ্ধপূর্ন হয়ে উঠল। বিশ শতকের চল্লিশের ওদশকের যখন স্বাধীনতা আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠল সেই কালপর্বে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন 'ঝড় ও ঝরাপাতকা'। ১৯৪৫ এ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অনবদ্য মানবিক রসাবদন যুক্ত উপন্যাস 'জাগরী' লিখলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। ১৯৪৭ এ রসিদ আলি দিবসকে পটভূমি করে ব্যাক্তির রূপান্তরের বাস্তব কাহিনী করলেন মানিক বন্দোপাধ্যায় 'চিহ্ন' উপন্যাসে। এছাড়াও তাঁর লেখা 'স্বাধীন তার স্বাদ জীবন্ত' উপন্যাষেও লেখকের বিশেষ রাজনৈতিক প্রত্যয় ব্যক্ত রয়েছে। ১৯৪৯ এ দুটি চরনে সতীনাথ ভাদুড়ী লিখলেন তোঁড়াই চরিত্র ওমানস'। এখানে ও অন্ত্যজ শ্রেনীর ঢোড়াই চরিত্রেদর রাজনখৈতিক চেতনায় ক্রমত্তোরনের এক অনবদ্য শিল্পরূপ রচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি ১৯৪৮ এ

শ্রমিক - মালিক দ্বন্দ ও পরিনতি নিয়ে লিখলেন চিত্রগুপ্তের কাহিনী তাঁর চরিত্র মানস তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । তাঁর সৃষ্ট রাজনৈতিক বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা লাভ করে আন্দোলনের অংশীদার হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার কালেই ঢোঁড়াই বা তার মত সাধারন চরিত্রেরা রাজনীতি সম্পর্কে হতাশ। এই চরিত্রের হতাশার মধ্যে দিয়েই ওরাজনৈতিক বোধ সম্পন্ন লেখক স্বাধীন ভারতের রাজনীতির ইতিহাস সত্যকে উপস্থাপিত করেছেন, জকারণ কংগ্রেসের স্বার্থলোভের লড়াই, গান্ধীবাদের নামে ব্যাক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার প্রবণতা রাজনৈতিকক কর্মীরূপে ওসতীনাথ নিজে কোনদিনও মেনে নিতে পপারেন নি। ঢোঁড়াইরাও হতাশগ্রস্থ অসহায় কারণ কোথাও বিশ্বাসের আশ্বাস তারা দেখতে পায়নি বরং তারা বুঝেছেন 'স্বাধীনতা শুধু বাবু ভাইদের জন্য', 'গদির লড়াই'। অনেক পরে সমরেশ বসু ও 'খন্ডিতা' উপন্যাসে গান্ধী চরিত্রের মহৎমূল্যায়ন ওকয়েকজন করেছেন তেমনি দলীয় রাজনৈতিক দের গান্ধীজির আদর্শের ভুল প্রয়োগ তাঁকে যন্ত্রনা বিদ্ধ করেছে। বনফুলের 'অগ্নি', মনোজ বসুর 'পথ কে রুখবে'। সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী' এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের ক্রান্তদর্শী উপন্যাসে গান্ধীজীর মহৎজীবনাদর্শের প্রতিশ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে।

গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত বিষয় ছাড়াও খাদ্যআন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনে আলোড়িত রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি জনজীবনের স্বরূপ এ সময়ের উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠল। গুনময় মান্নার 'জুনাগড় স্টীল', গোলাম কুদ্দুসের 'মরিয়ম', গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' উপন্যাসে শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিকের প্রতিবাদী ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। সমরেশ বসুর 'উত্তরঙ্গ', বি. টি. রোড়ের ধারে', 'জগদ্দল' উপন্যাসে শ্রমিকের স্বপ্নভঙ্গ হতাশা লড়াই গুরুত্ব পেয়েছে।

ষাটের দশক থেকেই রাজনৈতিক বিষয় ও মানুষের কেন্দ্রে রেখে চরিত্রের সঙ্কট ও তার রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে আরো বেশি মাত্রায় গল্প উপন্যাস লেখা শুরু হল। ১৯৬৪ তে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন ও তিনবছরের মধ্যেই ১৯৬৭ তে নকশাল পন্থী আন্দোলনের সূচনায় ছাত্র, যুবা যেভাবে জড়িয়ে পড়েছিল তা নিয়ে লেখা হয়েছে একাধিক উপন্যাস। মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, অসীম রায়, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশাপশি তপোবিজয় ঘোষ, সমরেশ মজুমদার, শঙ্কর বসু, শৈবাল মিত্র, কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর মত তরুন লেখকেরাও নকশাল আন্দোলন নিয়ে গল্প লিখেছেন । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রতিদ্বন্দী', বিমল করের 'যদুবংশ', রমাপদ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চৌধুরীর 'এখনই' প্রভৃতি উপন্যাসে যুবসমাজের হতাশা ও ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে স্পষ্ট আকারে। সমরেশ বসু লিখেছেন নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে 'মহাকালের রথের ঘোড়া' শিকল ছেড়া হাতের খোঁজে'। তপোবিজয় ঘোষ 'সামনে লড়াই' উপন্যাসে ১৯৬০-১৯৭০ এর মে মাস পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা, আন্দোলন নিয়ে উপন্যাসে লিখেছেন। দেবেশ রায়ের 'আপাতত শান্তিকল্যানে', ' মানুষ খুন করে কেন'। অসীম রায়ের 'একালের কথা', আবহমানকাল রাজনৈতিক উপন্যাসে সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা'য় নকশাল চরিত্র অনিমেষের বিপ্লব ও বন্দীদশা ও শেষে মুক্তির ক্রমিক বাস্তব রূপটি এঁকেছেন। শৈবাল মিত্রের 'অজ্ঞাতবাস', ও 'দেওয়ালের লিখন' অগ্নির উপাখ্যান নকশালি বাড়ির আন্দোলন ও বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল বলা যেতে পারে।

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস ওধারায় মহাশ্বেতা দেবী আলাদা গুরুত্ব দাবি করেন। তাঁর ললেখা অসংখ্য রাজনৈতিক গল্প এবং 'হাজার চুরাশির মা; (১৯৭৪), 'অগ্নিগর্ভ' (১৯৭৮), 'অরন্যের অধিকার' (১৯৭৫) প্রভৃতি রাজনৈতিক উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮ এ তিনি বলেছিলেন 'স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে ওআমি অন্ন, জল, জমি, বেটবাগরি কোনোটি থেকে দেশের মুক্তি দেখলাম না। যে ব্যবস্থা মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরুঙ্কুশ শুভ্র ও সূর্যাসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্ররনা। আসলে মানুষের কথাই তিনি নানাভাবে লিখতে চেয়েছেন।

সত্তর দশকে অপেক্ষাকৃত তরুন লেখকরা যারা কথাসাহিত্য রচনায় আগ্রহী হলেন তাঁরা অনেকেই মহাশ্বেতা দেবীর দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে উপন্যাস গল্পে উত্তর স্বাধীন সময়ের গ্রামবাংলার পরিবর্তন সাধরন মানুষের অধিকারবোধ, সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম গল্প উপন্যাসের বিষয় রূপে গ্রহণ করেছেন।

১৯৭৭ এ বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক ওগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থায় ব্যপক পরিবর্তন শুরু হল গ্রামে পঞ্চায়েতী ব্যবস্তা শুরুহল। একদিকে অপারেশন বর্গা অন্যদিকে মুক্ত অর্থনীতির হাতছনি, আবিশ্বের ক্ষেত্রেও ব্যপক পালাবদল বিশেষত সোভিয়েত ও ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতন। রাজার অর্থনীতি বিশ্বায়নের দিকে আকর্ষন ক্রমেই আশি নব্বই এবং শতাব্দী শেষলগ্নে নানা পরিবর্তনের মুখোমুখি এনে দাঁড় করাল। এইসময় অর্থাৎ আশি নব্বই দশকের উদীয়মান লেখকদের লেখায় এই সময়ের প্রতিফলন ঘটেছে, তাঁদের লেখায়

দেশকাল সমাজ আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠল। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কথাকবি - রামকুমার মুখোপাধ্যায়, তপন বন্দোপাধ্যায়, অমর মিত্র, শচীন দাশ, নলিনী বেরা, অনীল ঘড়াই, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, জয়ামিতধ্র, অনিতা অগ্নিহোত্রী, প্রমুখ লেখক কূল। দেশ কালের পরিবর্তনের সঙ্গে থেকে আজও উত্তর স্বাধীনতা পর্বের বাংলা উপন্যাস বিষয়বক্তব্য ও শিল্পরীতির নিরন্তর আধুনিক বয়ানরীতি গড়ে তুলতে তুলতে এগিয়ে চলেছে।

টিপ্পনী

সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাজসে প্রত্যাশা প্রাপ্তি - অলোক রায়

৩। পঞ্চাশের কথাকার - সম্পাদনা ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার

৪। উপন্যাস পাঠকের ডায়েরি - ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার

৫। কাললের প্রতিমা - ডঃ অরূণ মুখোপাধ্যায়

সহায়ক প্রশ্ন

১। স্বাধীনতা উত্তর উপন্যাসে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠল - মন্তব্যটি পর্যালোচনা কর।

২। স্বাধীনতা উত্তর আঞ্চলিক উপন্যাসের দারিদ্রৎপীড়িত মানুজষের জীবন স্থান পেল তা আলোচনা কর।

৩। বিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধের ঔপন্যাসিকের মধ্যে ইতিহাস চেতনা প্রবলভাবে দেখা দিল এ সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন কর।

৪। স্বাধীনতা উত্তর উপন্যাসে দেশভাগের প্রভাব ওপড়েছে তা আলোচনা করে বোঝাও।

৫। নগর কলকাতাকে কেন্দ্র করে এই সময় তৈরি হল নানা সংকটয় অবস্থা। এই সংকট ময় অবস্থার প্রভাব সাহিত্যে কতটা প্রতিফলিত ওতা লেখ।

টিপ্পনী

৪.৫. স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোট গল্প

ছোট গল্প এক শিল্পদিক। সে শুধু কাহিনী কথাই শেষ হয়ে যায় না।ছোট গল্প রচিয়তা এক আশ্চর্য নির্মাণ কৌশলল। সে যেন যুগযুন্ত্রনার ফসল। কারন সেখানে দেশকাল, সমাজপ্রেক্ষিতে ও বাস্তবতায় সূক্ষ্ম সযত্ন বুননের অভূতপূর্ব সমন্বয় ও বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ছোটগল্প তার জন্মের সূচনা কাল থেকে শিল্পাঙ্গিকের বীশিষ্ট নব নব পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে ধারন করে দেশকাল সময় সমাজের বাস্তব প্রেক্ষিতে সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে বাংলা ছোটগল্প স্বাধীনতা উত্তরকালের কয়েকদশকধরে বহু প্রতিভাধর ছোটগল্পের শিল্পস্বাক্ষরকে বহন করে চলেছে।

বাংলা ছোটগল্পের প্রকৃত ওসূচনা রবীন্দ্রনাথের হাতে আজকে একশতর বছরের অধিক সময়কাল ধরে যে বাংলা ছোটগল্প এগিয়ে চলেছে সেই শাখাটি মূলত সৃষ্ট সমকৃদ্ধ এবং আধুনিক ওপর্যায়চে উন্নীত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতেই। ১৮৯১ এ ‘হিতবাদী; পত্রিকায় প্রকাশিত ‘দেনাপাওনা’ ছোটগল্পটি ওথেকে ১৯৩৮ এ ‘জীবনসায়াহ্নে’ আনন্দবাজার পত্রিকায় সংখ্যায় লেখা ‘ল্যাবরেটরী’ গল্পের আধুনিকতাই এই সত্য প্রমাণ করে। ‘রবীন্দ্র ছোট গল্পে যে মনোবিশ্লেষনো ভাষার সাজুতা , বাক্য বব্যবহারের মাত্রাবোধ, গঠনশৈলীর ট্রাড়িশনাল ফর্ম, অলঙ্কারময়তা আমরা দেখতে পাই তা অতি সম্প্রতি কালের গল্প থেকে নিষ্প্রভ করে দেয়।

১৯২৩ -১৯৩০ এই সাতবছর ‘কল্লোল’ ও তার সহযোগী ‘কালিকলম’ প্রগতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রত্তর হয়ে ওঠার প্রবল প্রচেষ্টা নিয়ে বাংলা ছপোটো গল্পে অনাচরা সৃষ্টি করতে চাইলেন কল্লোলের ছোটগল্প লেখক গন। রবীন্দ্রবিদ্রোহই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এদের মুখ্যপ্রনেতা ছিল দারিদ্র্য, হতাশা প্রভৃতির ওযথাস্থিত বাস্তবরূপায়ন। এমনকি যৌনো জীবনকেও তাঁরা কোনো কল্পিত আবরনে আবৃত না রেখে রূঢ়ভাবে প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন। সেই সঙ্গে নগরজীবন চিত্রনের তুলনায় গ্রামীন জীবন ও নিম্নবর্নের জীবনতৃষ্ণাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্র রোমান্টিকতা, আদর্শায়িত প্রেমের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাঁরাও অনেকাংশ রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন।

সাতবছরের মধ্যেই কল্লোল বন্ধ হবে যায়। ১৯৩১ এ 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কল্ললের পূর্বতন লেখকগোষ্ঠির অনেকেই তাঁদের প্রতিভাকে দীপ্তীমান করার সুযোগ পেলেন একের পর এক ছোটগল্প লিখে। আসলে এঁরা কল্লোলের নির্দিষ্ট বানী ভঙ্গীর সীমাবদ্ধতায় কোনোদিনই আবদ্ধ ছিলেন না বরং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সার্থক প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সান্যাল, শৈললজানন্দ মুখোপাধ্যাব প্রমুখ গল্পকার বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকেই তিন বন্দোপাধ্যায় এবং জগদীশ গুপ্ত ও অন্যান্য ছোটগল্পকার যেমন বনফুল, শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়। বাংলা ছোটো গল্পকার রূপনীতি পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য স্বতন্দ্র ও ছোট গল্পের কনিষ্ঠাবান শিল্পী।

স্বাধীনতার আগে অর্থাৎ চল্লিশ দশকের প্রথমার্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তাকে কেন্দ করে সামাজিক -মানবিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিপর্যয় কালোবাজারী, মজুতদারী ও ১৯৪৩ এর মন্বন্তর নিয়ে বউ ছোটোগল্পকে নানা দিক থেকে পুষ্ট করেছেন তাঁদের অনেকেই জন্মেছেন ১৯১৮ -২০ কালপর্বে। এঁরা হলেন নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার চৌধুরী, মানিক বন্দোপকাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী এদের চেয়ে বয়সে বড় হলে তাঁদের লেখাতেও সমকাল, সামজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক নানা ছবি আঁকা হয়নেছে। এঁরা সকলেই চল্লিশের শেষে দেশজুড়ে দাঙ্গা, দেশভাগ, খন্ডিত স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু আগমন প্রত্যক্ষ করেছেন। এই সময়ের সামাজিক ওঅস্থিরতে, নৈরাশ্য, মানবিক হতাশা তাঁদের লেখাতেও ব্যক্ত হয়েছে। আদর্শবাদ, মানবিক ইতিবাচক মূল্যবোধের অবসান, বিশ্বাসের বিদায়, ব্যাক্তিজীবনের বাস্তবতা বাংলা ছোটগল্পে বারবার প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ী জাগরী, ঢোড়াই চরিতমানসের মত কালজয়ী উপন্যাস ছাড়াও অসসাধারন কতকগুলি ছোটগল্প লিখেছেন - গণনায়ক, বৈয়াকরকন, চকচকী, ডাকাতের মা, রাজকবি, চরনদাস এম. এল. এ, মহিলা করদাতা জীন্দাবাদ প্রভৃতি।

চল্লিশ পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলকা ছোটো গল্প লেখকগণ বাস্তবকে বেশি গুরুত্ব দিলেন। বাস্তবতা, স্পষ্টতা, ঋজুতা তাঁদেদর গল্পের মৌলিকগুন। সমকালের সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি, দাঙ্গা রাজনৈতিক হঠকারিতা স্বার্থপরতা, ভন্ডামিজ, গআমীন ওসমাজজীবননের অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপন্নতা, শোষন-

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পীড়ন, নির্যাতনো, ক্ষুধার জ্বালা, খাদ্যের অপ্রতুলতা, বেকারত্ব, আশহরয়ের আকুলতা বিক্ষোভ-মিছিল এই সময়কার ছোটগল্পের বিষয় পরিধিকে বিস্তারিত করল। রিলিফ - ত্রান, বন্টন নিয়ে পক্ষপাতিত্ব, কালো বাজারিই সবই ছোটোগল্পনকারের বলবার বিষয় রূপে প্রাধান্য পেল। মধ্যবিত্তজীবনের সংঘাত মূল্যবোধ ও আদর্শের ক্ষেত্রে সংশয় সম্পর্কের জটিল টানাপপোড়ন নিয়ে লেখকরা অসামান্যন গল্প লিখেছেন এসময়। মনে পড়বনে বিমলকরের আঙ্গুরলতা, আত্মজা, সোপান গল্পের কথা, রমামপদ চৌধুজরীর ছোটোগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের আশা নিরাশার সূক্ষদ্বন্দ্ব মনস্তাত্ত্বিক, সুপ্তবাসনা কামনা, মানবতার জয় পরাজয় যেন ঐ সময়কার অস্থির প্রতিচ্ছবি।

গতশতকের পঞ্চাশের দশকে ছোটোগল্পে নতুনরীতি আন্দোলন নিসন্দেহে গুরুত্বপূর্ন ঘটনা। অভ্যস্ত গল্পকথন রীতিতে যেন আআর বরা যাবে জনা মধ্যবিত্ত শ্রেনীর দ্বিধাদ্বন্দ, সংশয় সংকট। বিমলকরের ছোটো গল্প, নতুনরীতি প্রত্রিকাপ্রকাশকরে পঞ্চাশের কয়েকজন নবীন ছোটোগল্পকারের ছোটোগল্প এই পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রকাশ করলেন। স্বল্পায়ু পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যায় গল্পহীন গল্প লিখলেন দেবেশ রায়ন, দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, মতীনন্দী, জোতিরিন্দ্র নন্দী। প্রথম সংখ্যায় জোতিরিন্দ্র লিখলেন 'দুঃস্বপ্ন', দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হল দীপেন্দজরনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'জটায়ু'। তৃতীয় সংখ্যায় সন্দীপন লিখলেন 'বিজনের রক্তমাংস'। দেবেশ রায় লেখেন 'দুপুর' নামে একটি গল্পপ। সেদিন এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অজয় দাশগুপ্ত, অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, দিবেন্দু পালিত, রতন ভট্টাচার্য, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত বলিষ্ঠ ছোটো গল্পকারগন। এই নতুনরীতির গল্প শ্রেনীগত পরিচয়ের বদলে ব্যাক্তিগত পরিচয় প্রাধান্য পপেল। চরিত্রের আত্মমগ্নতা এবং বাইরের জগত থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনার ফলে একধরনের বিচ্ছিনতা প্রাধান্য পেল। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষদের মধ্যবিত্তজগত থেকে সরে এল এই সময়ে এদের গল্প।

ষাটের দশকে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের ধ্বংসকালীন আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, হাংরি আন্দোলন এর মাধ্যমকে নবীন ছোটগল্পকারেরা গল্পের বিষয় কী হবে, কীভাবে বলা হবে এ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এই দশক, শতভিষা, সাম্প্রতিক প্রভৃতি পত্রিকায়। আর ষাটের দশকের শেষপর্বে নকশালবাড়ি আন্দোলনের মত প্রবল রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাতেচদ বাংললা ছোটোগল্প আবার মোড় ফিরল, বাঁক নিল, নিজেকে বদলে নিতে চাইল - সে এক গভীজর গবেষনার বিষয়।

টিপ্পনী

পঞ্চাশে যারা নতুনরীতির গল্পআন্দোলনের গল্পহীন গল্প লেখায় ঝুঁকেছিলেন, তাঁরা কিন্তু সেই বিন্দুতে স্থিত থাকতে পারেন নি, এঁরা অনেকেই পরে স্বকীয় ভঙ্গীতে ছোটগল্প নির্মানে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। মতিনন্দী অতিন বন্দোপাধ্যায়ের গল্পে পুরনো রীতিকে মেনে নিলেও পঞ্চাশের রীতি বৈশিষ্ট্য চরিত্র গুলি ব্যাক্তি চরিত্র। তারা মূলত নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের তুষার হরিনী, পরী, দীনেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অশ্বমেধের ঘোড়া, চর্যাপদের হরিনী, হাওয়া না হাওয়া প্রভৃতি ছোটোগল্পে অর্ন্তমুখী ব্যাক্তি চৈতন্যের সূক্ষ্মটানা পোড়নের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। দেবেশ রায় একটি লেখায় স্পষ্ট করেই বলেছেন-

ব্যক্তি ও সমাজের আধুনিক তাৎপর্য আবিষ্কার ছিল পঞ্চাশের কৌঠার মাঝামাঝি গল্প উপন্যাসের সাবালক অনুশীলনের অব্যবাহিত পরিপেক্ষিতে। স্বাধীনতা লাভের পর দশবছর পেরোতে না পেরোতেই পরিবর্তন মান সমাজ, অপরিবর্তিত শাসন কাঠামো কআর ব্যাক্তি মানুষের সম্পর্কের গুনগত পরিবর্তনের ভেতরে গল্প উপন্যাসের কাজ শুরু করার চাইতে সৌভাগ্যের কথা সাহিত্যের পক্ষে আর কী হতে পারে।

'এই সচেকতন বা অসচেতন পরিপ্রেক্ষিতেই হয়ত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি আমরা যারা গল্প উপন্যাস লিখতে শুরু করি তাদের অনেকের বিষয় ও আঙ্গিকের এক নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন বোধ জাগিয়েছিল। সেই প্রেরনার ফলে বাংলা গল্পে উপন্যনাসে ততটা নয়, ভাষারন, ঘটনা বিন্যাষের, চরিত্র নির্মানের রূপকার্য আরোপের এমন কি গল্পের নামকরনেও নতুন নতুন চেষ্টা শুরু হয়।'

দেবেশ রায়ের পশ্চাৎভূমি, আহ্নিকগতি ও মাঝখানে দরজা, হাতকাটা, অপরাহ্নের কান্না প্রভৃতি গল্পে বিড়ম্বিতজীবনের নানা ছবি পাওয়া যায়। বরষেন গঙ্গোপাধ্যায়ের কালবেলা, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের গল্পে বারবার গ্রাম, মফস্বলের, গঞ্জের মানুষ মেসবাড়ির জীবন ও ব্যাক্তিজ একক নিঃসঙ্গতার কথা পাওয়া গেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি সাঁতার ও জলকন্যা, দৌড়, দূরত্ব। অসীম রায়ের গল্পে ছিন্নমূল মানুষের ওদুঃখদুর্দশার ছবি, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত তাঁর লেখারবিষয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রফুল্ল রায় বাংলা ছোটোজ গল্পে সংযম সততা ও সাধনায় উজ্জ্বল করে রেখছেন। উপেক্ষিত গ্রামবাংলার আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে নানা অজ্ঞাত বিষয় নিয়ে গভীর গল্প লিখেছে সিরাজ - যেমন 'গোঘ্ন' র মত বলিষ্ঠ গল্প তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

টিপ্পনী

ষাটের দশকেদর ভুলভ্রান্তিজ আন্দোলন বাংলা ছোটগলো্পের ব্যাপজতি বৈচিত্র ঘটিয়েছে। ১৯৬৪ তে হাংরি আন্দোলনের আন্দোলন যখন তুঙ্গে, যখন যারা ইশতাহার ছা পিয়ে সবকিছুকে অগ্রাহ্য করাচর প্রবণতায় ব্যস্ত সেই সময় কম্যুনিষ্ট পাটির ভাঙনো, সি. পি. এম পার্টির জন্ম। এই সময় আংরি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বাসুদেব দাশগুপ্তের গল্পের লাইন 'এইখানে হৈমন্তীর মাংসাপাওয়া যায়.....' সুবিমল বসাক লিখেছেন - 'একেক সময় মনে হয় আমার ফ্যান কিছু নাই - শরীর চামড়া, হাড়গোড় মাথা বুক বেবাক কিছু গতর থিক্যা আলাদা হইয়া ইদিক উদিক ছিটাইয়া আছে।" হাংরিরা গল্প কবিতায় ব্যাক্তির নিজের কথা, নিজের অনুভব আবেগ কষ্ট কেই যথাযথ ভাবে বলতে চেয়েছেন, কিন্তু সবই সরব জোরালো উন্মুক্ত ভাবে। পঞ্চাশের গল্পকারদের মত আতমগ্ন অনুসন্ধিৎসার মৌন উচ্চারন নয়। ষাটের দশকের শেষপর্বে এইদশক পত্রিকায় লেখকরা শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন করলেন ১৯৬৬ তে। তাঁরা স্পষ্ট করেইজ বললেন 'আমরা শিল্পের শাস্ত্রাবিধি মানিনা। আমাদের কোনো সামাজিক দায় নেই। শুধু তাই নয় তাঁরা ফরমান ঘোষনা করলেন 'গল্পে এখন যারা কাহনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে। আসলে তাঁরা মনোজগতের গহিনে ডুব দিয়ছে কাহিনী বর্জিত অনুভবকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাদর কতটা সফল হয়েছিলেন সেকথা কাল বিচার করবে। রমানাথ রায়ন, অতীন্দ্রীয় পাঠক, আশিষ ঘোষের শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক পত্রিকায় ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলনের সূত্র মেনেই ঐ পত্রিকার একমাত্র ছোটগল্পকার চন্ডীমন্ডল সারাজীবন গল্পহীন গল্প, মনোজগতে ডুব দিয়ে অনুভবকেই গল্পের আধার আশ্রয় রূপে গ্রহন করে লিখেছেন জীবন জন্ম, মড়া, ফাঁদ, মৃত্যুর পথে দুঃখ ইত্যাদি গল্প।

ষাটের মধ্যভাগ থেকেই আবার রাজনৈতিক জটিলতা, ১৯৬৬ জখাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭ তে সি.পি. আই. এম এর থেকে বেরিয়ে এসে একদল সি.পি. আই. এম. এল দল গঠন করে দুনিয়া বদলে দেবার অঙ্গীকার করে। ইতিমধ্যে সাতষট্টিতে প্রথম যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে যা নিয়ে অসীম রায় লিখেছেন আরাম্ভর মত গল্প। আর সাতষট্টি থেকে উনসত্তর নকশাল বাড়ি আন্দোলন ছোটগল্পের কালান্তর ঘটিওয়েছে। গৌরবময় সগ্রাম, সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্বপ্ন অসীম রায়ের 'অনি' সিদ্ধার্থঘোষের 'বার্তা', ব্যাক্তিসন্ধ্যা' গল্পে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করল। এছাড়া ও এই সময়ে মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প অস্থির সময়ের নানা কথা, কৃষিজীবি ও আদিবাসী জীবনের বঞ্চনার নানা চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অসুখী সময়কে চিহ্নিত করে তিনি লিখে

ফেলেছেন একাধিক ছোটগল্প যা সত্তর আশির নবীন গল্প লেখকদের বিশেষ অনুপ্রেরনা। তাঁর লেখা দৌপ্রদী, স্তনদায়িনী, বিছূন প্রৃতি উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি পাওয়া যায়। প্রচলিত সমাজ রাজনীতির গড্ডালিকায় শোষিত জীবনের নির্মম করুন জীবনকে তিনি একের পর এক গল্পে চিত্রিত করেছেন। বাংলা ছোট গল্প প্রতিবাদের এক বিশেষ ভাষা রচনা করলেন তিনি।

টিপ্পনী

সত্তরের দশকে হয়তো পুরোপুরি মুক্তির দশকে পরিণত করা যায় নি। তবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্রুত পটপরিবর্তন নানা রদবদলের দ্বারা অস্থির সময় সমাজ রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাকে আমূল নাড়া দেওয়ার প্রবল চেষ্টা হয়েছিল। যে কারনে অনেকেই বলেছেন সে সময়কার সাহিত্যে বিশেষত ছোটগল্পে 'সত্তরদশক স্থবিরতা ও প্রতিষ্ঠানিকতাকে বর্জন করে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন বিরাট জাদু আয়নার মোহজাল। শপথ করেছিল কাব্যিক নির্জনতা ছেড়ে যারা পথে প্রান্তরার কারখানায় কাজ করে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কলম হয়ে উঠবে শল্যকায়ের ছবি, সমাজের শরীর থেকে বাদ দেবে জরাগ্রস্ত শিরা। জীবন্ত নবীন শিরায় বইয়ে দেবে সতেজরক্ত। কথা ছিল, এই চিন্তায় নতুনধারায় ছোটগল্পের জন্ম হবে এই দশকে।' (সত্তরদশকের ছোটগল্প অনুষ্টুপ১৯৮০)

সত্তরদশকে কৃষিবিপ্লব তথা মার্কসবাদী ওও মাওবাদী রাজনীতির প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয়ই ছোটগল্পকার গন তাদের কলমে জীবনবেদ ও শেষন অত্যাচারের প্রতিবাদকেই বানীরূপ দিলেন। শোষনমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন এই সময়ের কিছু মানুষ। বাতাসে তখন বারুদের গন্ধ। ঘরে ঘরে তরুণ যুবার দুনিয়াবদলের স্বপ্ন। সেইসঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মবিশ্লেষন আত্মসমীক্ষার দশক এই সত্তর দশক এই দ্রোহকাল ও প্রতিবাদের আগুন জ্বালাতে চেয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য স্বার্থে সত্তর দশককে পুরোপুরি মুক্তির দশকে পরিনত করা সম্ভব হয়নি। অনেক সম্ভবনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বসন্তের নির্মোঘরূপে শহরে গ্রামে গ্রামন্তরে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু ব্যাক্তিহত্যা, মূর্তিভাঙ্গার রাজনীতির অতিশয্যা, কৃষিজীবীদের মধ্যে আন্দোলনের ভিত তেমন সুদৃড় না হওয়ায় এবং সমাজ বিরোধীদের অবাধ প্রবেশ প্রভৃতি কারনে নকশাল আন্দোলন সফল হল না। ১৯৭২ এর মধ্যেই আন্দোলন দমন সংগঠনের বিভিন্ন নেতা - কর্মীদের বন্দী করারা ফলে আন্দোলন থিতিয়ে গেল। পুলীশ ও কেন্দ্রীয়বাহিনীর নিপীড়নে অনেক প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন

টিপ্পনী

যুবক প্রাণহারাল। এইসব সম্ভবনাময় যুবকদের রাজনীতির পথে হয়তো ভ্রান্তি থাকতে পারে কিন্তু তাদের আত্মোৎমার্গের আদর্শবাদে কোনো ফাঁকি ছিল না। 'বস্তুত হত্যা প্রতিহত্যায় এক রাজনৈতিক আদর্শবাদের অপমৃত্যু ঘটল,' তা আজও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল না।

গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা গেল না। কিন্তু সময় থেমে থাকে নি। গ্রাম শহর দুয়েরই পরিবর্তন হল। নকশালবাড়ির রক্তাক্ত মাটিতে যে প্রতিবাদ গর্জে উঠেছিল তার ফলস্বরূপ গ্রামজীবন পালটাতে শুরু করেছিল ; শহরও একই রকম থাকেনি। এই সময়েই গ্রামের ভাগচাষীরা বেনামী জমি উদ্ধার - বন্টন এবং শেষে সলের দাবিতে সেচ্চা হয়। এই সময় কৃষক আন্দোলনের নানা ঘটনা ঘটতে লাগল পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও। আশির দশকে অপারেশন বর্গা, নতুন কৃষি সম্পর্কে গড়ে তোলার চেষ্টা, ওতদার, ভাগচাষি, আইন-আদালত, আন্দোলন, ফসলের অধিকার নিয়েই লেখা হল আশির দশকের বাংলা ছোটগল্প।

আশির দশকের ছোটগল্পের পুরোভাগের রয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনিই এই দশকের ছোটগল্পকারদের প্রেরনা দাত্রী। ততদিনে লেখা হয়েগেছে মহাশ্বেতা দেবীর বিশেষ বিশেষ গল্প দৌপ্রদী, ভাতুয়া। দেবেশ রায় জমি বন্দোবস্ত নিয়ে লিখে ফেলেছেন 'জোতজমিই' নামে ছোটগল্প। নবীন গল্পকার অমর মিত্রের মাঠ ভাঙ্গে কালপুরুষ গল্পসঙ্কলনের গল্পগুলিতে গ্রামজীবন নানা সমস্যা খরা বন্যা, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি নিয়ে গল্প পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন ডাইন, দানপুত্র, গাঁওবুড়োর মত গল্পগুলি। কানাই কুন্ডু, অণিল ঘড়াই, আফসার আমেদ, ঝাড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, নলীনী বেরা, শচীনদাস এসেগেছেন ছোটগল্পের জগতে। তাঁদের লেখায় নিম্নবর্ণ শ্রমজীবি সমাজ, গ্রামীন জীবনের শোষন বঞ্চনার ছবি আঞ্চলিক জীবনও ভাষার অবাধ প্রবেশ বাংলা ছোটগল্পের সমাজ পরিবেশ পরিউস্থিতি জীবনধারায় এক বিশ্বস্ত দলিল হয়ে উঠল।

আশি পেরিয়ে নব্বই। এই একটা দশকেই বিশ্বপটে নানা পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পালাবদল এর ইঙ্গিত দিল। ১৯১১ থেকেই ভারতীয় আর্থনীতিতে উদারীকরন শুরু হল তার ঢেউ এসে বাঙালি জীবনকেও আমূল নাড়া দিল। বাঙালির স্বাধীনতা পরবর্তী আর্থ সামাজিক ধ্যান ধারনার আমূল বদল শুরু হল নব্বই এর দশক থেকে নতুন একবিংশ শতাব্দীর দুই দশক ধরে। এক অর্থে আজ আমরা ভোগবাদী,

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পর্যুদস্ত। বৈদুযতিন পন্যের যথেচ্ছ প্রবেশ ও ব্যবহার, মিড়িয়া সংস্কৃতি চোখ ধাঁধানো বাজার শপিংমল, ফ্লাইওভার, আগ্রাসী নগরায়নের স্বাচ্ছন্দ্য, গ্রাম্য কৃষি পরিবেশকেও গ্রাস করতে শুরু করেছে। বাজার অর্থনীতি ভোগ্যপনের চাহিদায় শহর ও গ্রামের মানুষ ক্রমেই আবিষ্ট হয়ে পড়েছে। মূল্যবোধের পরিবর্তনে এই আর্থসামাজিক পরিবেশের প্রভাব ভয়ঙ্কর। আজকের ছোটগল্পকারেরা এই সময়ের সঙ্কট আকর্ষন দুই নিয়েই গল্প লিখেছেন। কারন ছোটগল্প যে যুগস্ত্রনার ফসল।

বলা বাহুল্য এ প্রবন্ধ স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনার ক্ষেত্রে একটি সূচনা বলা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে সম্পূর্ন সাল তারিখ ধরে ধরে লেখা সাইত্যের ইতিহাস নয়, অনেক গল্পকারই সে কারনে হয়তো উল্লিখিত হলেন না, কিন্তু সময়ের চালচিত্রকে দৃঢ়তা দিতে তাদের ভূমিকাও কম নয়। স্বপ্নময় চক্রবর্ত্তী, অভিজিৎ সেন, নারায়ন ভট্টাচর্য, সুবিমল মিশ্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, চন্ডী মন্ডল, বিমান চট্টোপাধ্যয়, শৈবাল মিত্র প্রমুখ নিষ্ঠাবান দায়িত্ব সম্পন্ন ছোট গল্পকারেরা ষাট সত্তর আশি নব্বই ও বর্তমান শতকে ছোট গল্পের জগৎকে স্বকীতায় সার্থক করেছেন। তাঁদের শ্রম চেষ্টা শৈল্পিক দক্ষতা প্রশংসনীয়।

আসলে রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলা ছোটগল্পের যে যাত্রাপথের যে সূচনা একুশ শতকের এসেও তারগতি অব্যাহত। দশকে দশকে নানা বাঁক নিতে নিতেই সে আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রতিনিয়ত তার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র বদল নতুন সংযোজন ঘটেছে তেমনি রূপরীতি বানীভঙ্গীর বদল ঘটেছে। ব্রতটাই বদলাচ্ছে যে আজ আর ছোটগল্পকে পূর্বতন প্রচলিত সংজ্ঞায় বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। বাংলা ছোটগল্পের প্রাচুর্য প্রসার ও বৈচিত্র সত্যিই আজ বিস্ময়কর।

৪.৬. সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী

২। কালের পুত্তলিকা - ড: অরূন মুখোপাধ্যায়

৩। ছোটগল্পের কথা - রথীন্দ্রনাথ রায়

৪। গল্প পাঠকের ডায়েরি - ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

৫। বিশ শতক - ডঃ অলোক রায়

৬। আমার কালের কথাসাহিত্যিক - জগদীশ ভট্টাচার্য

৭। প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্প স্বাধীনতার - সম্পাদনা - শম্পা চৌধুরী আগে ও পরে

৮। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা - পরিচয়, অনুষ্টুপ, সত্তর দশক সংখ্যা, 'কোরক' প্রাক শারদ সংখ্যা - ১৪০১, 'কোরক' শারদীয় সংখ্যা - ১৪১২

৪.৭. আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। স্বাধীনতা উত্তর ছোটগল্প মূল্যবোধ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় কিভাবে ধরা পড়েছে আলোচনা কর।

২। মধ্যবৃত্তের জীবন সংকট স্বাধীনতা উত্তর ছোটগল্পে প্রাণ পেল - বিষয়টি পর্যালোচনা কর।

৩। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোন কোন কথা সাহিত্যিকের লেখায় প্রান্তিক মানুষের জীবন স্থান পেল। পর্যালোচনা কর।

৪। ছয়ের দশকের বিভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলন ও ছোটগল্পের পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখা গেল। তা বিস্তারিত জানাও।